কিশলয়

তৃতীয় ভাগ

· পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার ·



নকলগড়

কিশলয়

তৃতীয় ভাগ

(পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)

সাহিত্য

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশক ঃ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স বিল্ডিংস্
কলিকাতা

নূতন সংস্করণ জানুআরি ১৯৬৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৬৪

মূল্য ১·২০ পয়সা মাত্র
সাহিত্য ও গণিত একত্রে

মুদ্রক ঃ

ইস্টার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

ভূমিকা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের অভিমত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কয়েক বৎসর আগে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য মাতৃভাষা ও অঙ্কের পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অল্প মূল্যে সহজবোধ্য পুস্তক রচনা ও পরিবেষণও এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

একই রচনা বহুদিন ধরে পাঠ্য পুস্তকে থাকলে তার পঠন-পাঠন ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েরই মানসিক উদ্যম ও আনন্দ জাগানোর পক্ষে সহায়ক; সেই জন্য পুস্তকগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ও বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাস করা হল।

এবারের 'কিশলয়'-এর লক্ষণীয় পরিবর্তন সবগুলি গদ্য রচনার চলিত ভাষায় প্রকাশ। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, একই পাঠ্যপুস্তকে চলিত ও সাধু ভাষায় রচনা পাঠ করার ফলে অল্প বয়স্ক বিদ্যার্থীর পক্ষে উভয় ভাষারীতির মিশ্রণ না ঘটিয়ে যে কোন একটিতে বিশুদ্ধভাবে লেখা কঠিন হয়ে পড়ে। কথ্য ভাষারীতির সঙ্গেই তাদের পরিচয় স্বাভাবিক হবে বলে 'কিশলয় সংস্কার কমিটি'র সুপারিশক্রমে 'কিশলয়'-এ সংকলিত সবগুলি গদ্য রচনাই কথ্য ভাষায় প্রকাশিত হল। এই উদ্দেশ্যে সাধু ভাষায় লিখিত মূল রচনাগুলিও কথ্যরীতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই ভাষারীতিতে অভ্যস্ত হলে পরে সাধু ভাষার সঙ্গে যখন তাদের পরিচয় হবে তখন দুই রীতির বৈশিষ্ট্য

তাদের নিজেদের রচনায় তারা পৃথক্‌ভাবে রক্ষা করতেও সক্ষম হবে। বানানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট রীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

'কিশলয়'-এর বিষয় বস্তুতেও কিছুটা নূতনত্ব দেখা যাবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ছাত্র সম্প্রদায় যাতে মহান্‌ আদর্শ, মহৎ জীবন, দেশের সম্পদ্‌, রহস্যময় প্রকৃতি ও মানব মনীষার বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে সেই উদ্দেশ্যে বিবিধ রচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় সংহতি, অরণ্য ও বন্য জীবন, মহাকাব্যের পরিচয়, মহাকাশের রহস্য, সমুদ্র প্রভৃতি প্রসঙ্গে অন্যান্য রচনার সঙ্গে 'কিশলয়'-এ স্থান পেয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয় কাগজ সুইডিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নিকট থেকে দানস্বরূপ পাওয়া গেছে। এর ফলেই এই পুস্তকের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ করা গেল। সুইডিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সরকারের শিক্ষানুরাগের পরিচায়ক এই দান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

যেসব লেখক বিশেষভাবে 'কিশলয়'-এর জন্য বিভিন্ন বিষয়ক রচনা লিখে দিয়েছেন এবং যে সকল মুদ্রিত পুস্তক থেকে অংশবিশেষ গৃহীত হয়েছে সেই সব লেখকদিগকে এবং সে সকল পুস্তকের প্রকাশকগণকে ধন্যবাদ জানাই। 'কিশলয়' অলংকরণে ও প্রকাশনে যাঁরা অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

রাইটার্স বিল্ডিংস্‌,
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩।

শ্রীভবতোষ দত্ত
শিক্ষা-অধিকর্তা

পদ্যাংশ

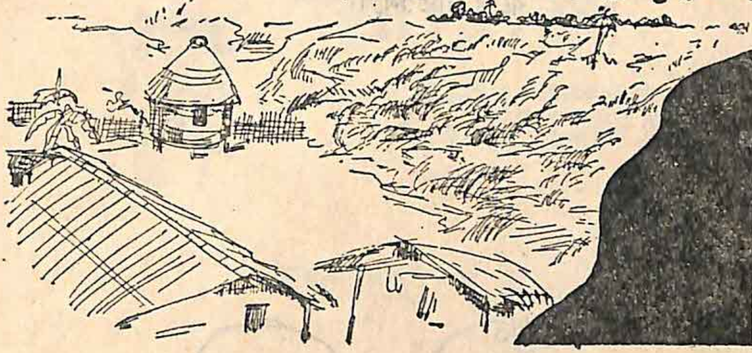
সূচীপত্র

গদ্যাংশ

সূচীপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরম



বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্

শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্

ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটি কণ্ঠ-কল-কল নিনাদকরালে

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীম্ নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীম্ মাতরম্ ॥
বন্দে মাতরম্ ।





আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাস

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
"মানুষ হইতে হবে"—এই যার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাহি কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়?
সে ছেলে কে চায় বল, কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়?
সাদাপ্রাণে হাসিমুখে কর এই পণ—
"মানুষ হইতে হবে, মানুষ যখন।"

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার,
সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার।
হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান,
তোমরা "মানুষ" হলে দেশের কল্যাণ।





বঙ্গভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা!

কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আনল দেশে ভক্তি-ধারা ;
আছে কই, এমন ভাষা
এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা।

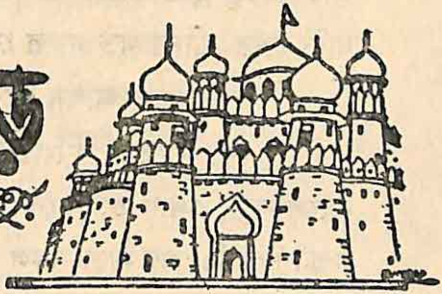
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আন্‌ল মালা জগৎ জিনে ;
তোমার চরণ-তীর্থে, মা গো,
জগৎ করে যাওয়া আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা বলে,
ঐ ভাষাতেই বলব হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।



নকলগড়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



"জলস্পর্শ করব না আর" চিতোর রানার পণ,
"বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ।"
"কী প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ
মানুষের যা অসাধ্য কাজ,
কেমন করে সাধবে তা আজ?" কহেন মন্ত্রিগণ।
কহেন রাজা "সাধ্য না হয়, সাধব আমার পণ॥"
বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে যোজন তিনেক দূর।
সেথায় হারা-বংশী সবাই, মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইক জানা,
তাহার সদ্য প্রমাণ রানা পেয়েছেন প্রচুর।
হারা-বংশীর কেল্লা বুঁদি, যোজন তিনেক দূর॥

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি, "আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মত নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দেবেন ভেঙে ধূলির 'পরে
নইলে শুধু কথার তরে হবেন আত্মঘাতী।"
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে নকল কেল্লা পাতি॥

কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য, হারা-বংশী বীর,
হরিণ মেরে আসছে ফিরে, স্কন্ধে ধনু-তীর।
খবর পেয়ে কহে, "কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারা-বংশী রাজপুতেরে করবে নতশির?
নকল বুঁদি রাখব আমি হারা-বংশী বীর॥"

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন রানা মহারাজ।
"দূরে রহ", কহে কুম্ভ—গর্জে যেন বাজ।
"বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা,
নকল গড়ের মাটির ঢেলা, রাখব আমি আজ।"
কহে কুম্ভ,—"দূরে রহো, রানা মহারাজ!"

ভূমির 'পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর,
একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে,
মুণ্ড কাটে তরবারে
খেলাঘরের সিংহদ্বারে পড়ল ভূমি-'পর,
রক্তে তাহার ধন্য হল নকল বুঁদিগড়।



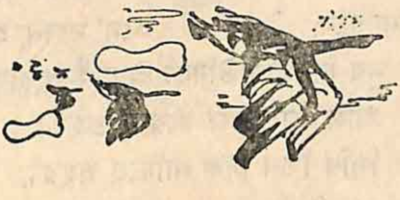
দেখব এবার জগৎটাকে



নজরুল ইসলাম

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে।
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কেমন করে বীর-ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি—
কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধুযানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে উঠে জোয়ার বানে।

কেমন করে মথলে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে,
তুহিন-মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্‌পুরে—
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল হতে আসছে উড়ে।
রইব নাকো বদ্ধ খাঁচায় দেখব এসব ভুবন ঘুরে,
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশ দিকেতে পড়বে লুটে,
পাতাল ফেঁড়ে নামব আমি উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

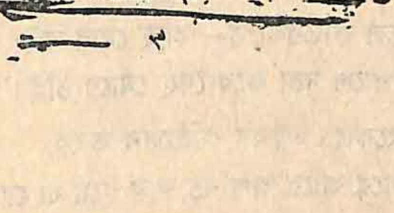




অতুলপ্রসাদ সেন

বল, বল, বল সবে শত বীণা বেণুরবে।
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে॥
আজ গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহা বন
প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন
কহিছে গৌরবকাহিনী॥

বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী
বহু বীরবালা বীরেন্দ্রপ্রসূতি
আমরা তাদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান।
পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ
আমরা তাদেরই সন্ততি॥





দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ,
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে—"গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।"
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।

ভক্ত কহে, “প্রভু, মোরে কী ছল ছলিলে।”
দেবতা কহিল, “মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।”





গার্হস্থ্য চিত্র

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ফুটফুটে জোছনায় ধব্‌-ধবে আঙিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি জুঁই শেফালিকাগুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে ;
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা, ঝুমুকা-লতা,
দুলিতেছে চন্দ্রকরে নেয়ে।
মৃদু ঝুরঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল ;
প্রশান্ত মুখের 'পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
আলসেতে আঁখি ঢুলঢুল।

মৃদু মৃদু ধীর হাতে আঘাতি শিশুর মাথে
গায় ঘুমপাড়ানিয়া গান
মোহিয়া সুন্দর ভাবে আকুল কি ফুলবাসে
পিঞ্জরে ধরেছে পাখি তান।

শিহরেতে জেগে শশী যেন সে সৌন্দর্য-রাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে
ছেলে ডাকে, 'আয় চাঁদ', মা বলিছে, 'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!

মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি চাঁদে চাঁদে মেশামেশি,
স্বর্গে মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে॥





দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপখান তিনদাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিনভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

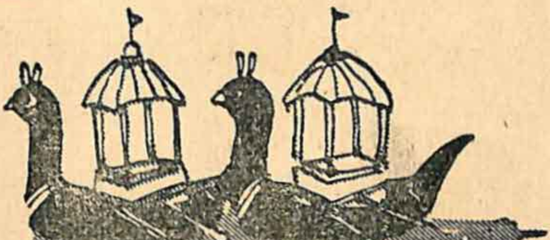
পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীরঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বনহাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপচুপ—ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপটুপ
ঘোমটার বৌটি।

ঝকঝক কলসীর
বক্‌বক্‌ শোন্‌ গো
ঘোমটায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্‌ গো।

তিনদাঁড় ছিপখান
মন্থর যাচ্ছে,
তিনজন মাল্লায়
কোন্‌ গান গাচ্ছে?



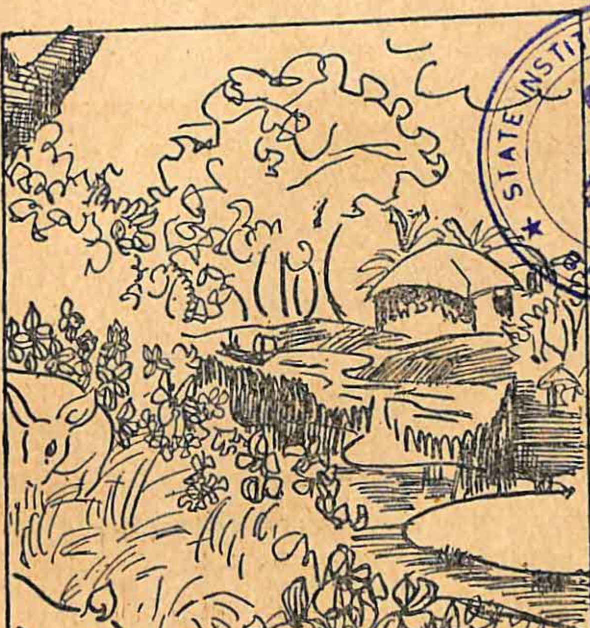


বনবাস

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারি নে কি
তুমি ভাবছ মনে ?
চোদ্দ বছর ক-দিনে হয়
জানি নে মা ঠিক,
দণ্ডকবন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক্।
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করি নে তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর।
সামনে দিয়ে বইত নদী
পড়ত বালির চর।



ছোটো একটি থাকত ডিঙি
পারে যেতেম বেয়ে—
হরিণ চরে বেড়ায় সেথা,
কাছে আসত ধেয়ে।

গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম
আমি নিজের হাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।
কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
কত রকম ফুলে
মালা গেঁথে পরে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুড়ি ভরে ভরে এনে
ঘরে দিতেম রেখে;
খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে;
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।
রোদের বেলায় অশথতলায়
ঘাসের 'পরে আসি
রাখাল-ছেলের মতো কেবল
বাজাই বসে বাঁশি।
ডালের পরে ময়ূর থাকে
পেখম পড়ে ঝুলে—
কাঠবেড়ালি ছুটে বেড়ায়
ন্যাজটি পিঠে তুলে।

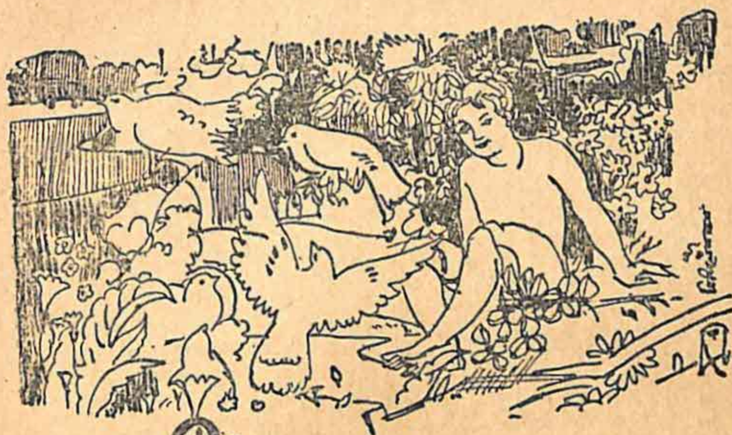
কখন আমি ঘুমিয়ে যেতেম
দুপুর বেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

সন্ধেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকনো ডাল পালা,
বনের ধারে বসে থাকি
আগুন হলে জ্বালা।
পাখিরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধেতারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে,—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

ঠাকুরদাদার মতো বনে
আছেন ঋষি মুনি,
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে
গল্প অনেক শুনি।
রাক্ষসেরে ভয় করি নে
আছে গুহক মিতা,
রাবণ আমার কী করবে মা,
নেই তো আমার সীতা।

হনুমানকে যত্ন করে
খাওয়াই দুধে-ভাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।
মা গো আমায় দে না কেন
একটি ছোটো ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা
বনে চলে যাই।
আমাকে মা, শিখিয়ে দিবি
রামযাত্রার গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চুড়ো
হাতে ধনুকবাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এমনি বরষাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।



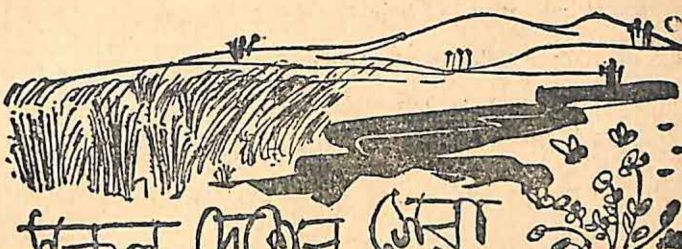


ছুটি

কালিদাস রায়

। ইংরাজী হইতে অনূদিত ।

আজকে মাগো এলোমেলো বাতাস কেমন খেলে
কোন কাজই আজ লাগে না ভালো,
দেখ মা ঐ ফুলগুলো সব আরাম করে হেলে
পিইছে কেমন নীল গগনের আলো।
দেখ মা ঐ দুষ্টু চাঁপা মুখ লুকিয়ে হাসে,
ঝিরঝিরিয়ে ঝরনা বহে অই,
প্রজাপতি গোলাপ ফুলে মধু খেতেই আসে
মধু খেতে উৎসাহ তার কই?
ভুলো মোদের ঘুমায় রোদে দিব্যি আরাম করে,
মাছিগুলো চার ধারে তার বুলে,
কাছেই পুষী খুশির নেশায় ঢুলছে ঘুমের ঘোরে
মুখটি ধোয়ার কথাই গেছে ভুলে।



সকল দেশের সেরা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় এমন উজল ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে।
সেথা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি॥

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি॥

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি॥





আমরা চাষ করি আনন্দে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা চাষ করি আনন্দে—
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে বাঁশের বনে পাতা নড়ে
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে॥
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে সকল ধরা হেসে ওঠে
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দ্রে॥





জানাজানি

অজিত দত্ত

জানাজানি নিয়ে মিছে হানাহানি
কে বা জানে কতটুকু?
পরীদের কথা বড়রা জানে না
জানে ছোট খোকাখুকু।
তেপান্তরের মাঠের খবর
কোন্ বড়বাবু জানে?
শরতে শেফালী কুড়োতে কী মজা
লেখে কি তা অভিধানে?

বাদলের মেঘে ময়ূরেরা নাচে
রোদ্দুরে নাচে মন,
কেন যে সে কথা কারো জানা নেই
যত পণ্ডিত হোন।

ছোটদের মনে হাসির তুবড়ি
দিন রাত কেবা জ্বালে,
বড় হলে লোকে কেন হাঁড়ি মুখে
চলে গম্ভীর চালে?
কেন কি কোথায় কবে কার সবি
বই পড়ে যারা শেখে
ফুল নদী তারা কেন ভালো লাগে
জানে তারা কোত্থেকে?





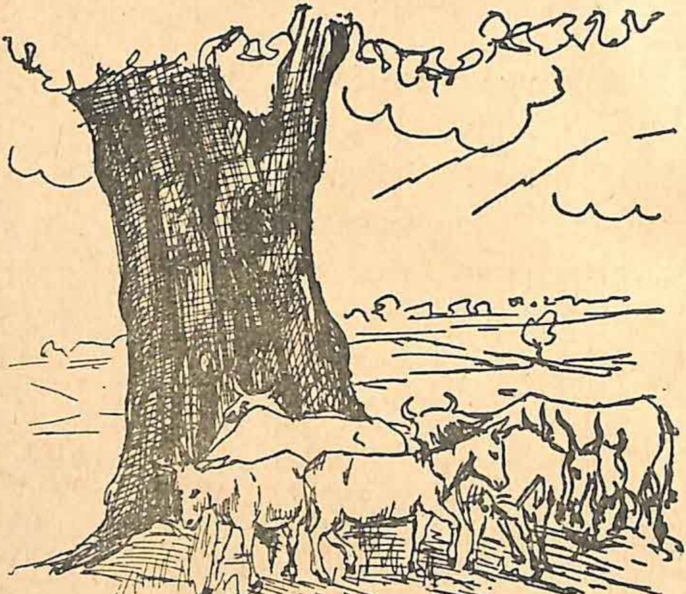
মায়াতরু

অশোক বিজয় রাহা

এক যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দু হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর
বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কি-যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হল যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রূপালী এক ঝালর।



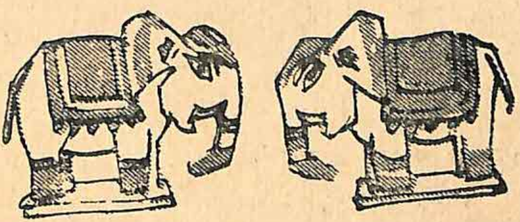


সকলের সুখ

অন্নদাশংকর রায়

গোটা দুই গাধা গুটি দুই ছাগ
ছয়টি বাছুর গরু
এদের মাথায় ছাতা ধরিয়াছে
একটি শিরীষ তরু!
কোথা হতে এক কাক জুটিয়াছে
উঠিয়াছে কার পিঠে
কাছে দেয় হানা মুরগীর ছানা
মুরগীও দুচারিটে।

সকালে যখন জল এসেছিল
সকলে আছিল স্থির
এইবার রবি আঁখি মুছিয়াছে
এরা ঝাড়িতেছে নীর।
ফাটা নারিকেল নাড়াচাড়া করে
একটি ছাগল ছানা
অসহায় গাধা ল্যাজ বুলাইয়া
কাকেরে জানায় মানা।
মাঠভরা ঘাসে মুখ লাগায়েছে
পাশাপাশি সকলেই
ফড়িঙের খোঁজে শালিকগুলার
মারিবার তর নেই।
চিরদিবসের গ্রন্থ হইতে
একখানি পাতা এই
এতে লিখিয়াছে—"সকলেই আছে
সকলের সুখ সেই।"





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্বতে!
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত-শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥



শারদশ্রী

শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সৌজন্যে

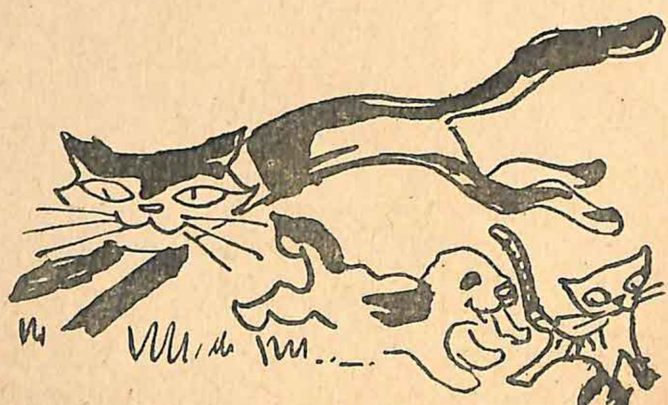
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণ মূলে।
গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসি-ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে॥
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলক কোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে!
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা॥

বৃথা দর্প

রজনী কান্ত সেন

নর কহে, "ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে—
চিরকাল পড়ে রলি চরণের নীচে!"
ধূলিকণা কহে, "ভাই, কেন কর ঘৃণা?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা?"

মেঘ বলে, "সিন্ধু তব জনম বিফল,—
পিপাসায় দিতে নার এক বিন্দু জল!"
সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে?
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এবুকে।"



প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



অন্তর মম বিকশিত কর,
অন্তরতর হে।
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর,
সুন্দর কর হে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর,
নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর,
অন্তরতর হে॥

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণ-পদ্মে মম চিত
নিঃস্পন্দিত কর হে—
নন্দিত কর, নন্দিত কর,
নন্দিত কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর,
অন্তরতর হে॥





আমাদের দেশ

মায়ের প্রতি সন্তানের যেমন টান দেশের প্রতি মানুষের তেমনি টান। যে দেশে আমাদের জন্ম তাকে বলি জন্মভূমি। এই জন্মভূমি আমাদের জননীর মতো। এই জন্য তাকে বলি মাতৃভূমি, বলি দেশমাতা। তোমরা 'বন্দেমাতরম্' গান শুনে থাকবে। ঐ গানে যে মায়ের কথা বলা হয়েছে সেই মা আমাদের দেশ। সব দেশের ছেলেমেয়েরাই নিজের দেশকে ভালবাসে। মনে করে তার দেশ সকল দেশের সেরা। আমাদের দেশের কবি বলেছেন—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। তোমরা ভাবছ কবি বুঝি বাড়িয়ে

বলেছেন। কিছুই বাড়িযে বলেন নি; বাড়িয়ে বলবার প্রয়োজনই হয় না, এমন সুন্দর এই দেশ। দেশের রূপটি একবার কল্পনা করে দেখ—তিন দিকে নীল সমুদ্র, উত্তরে তুষারশুভ্র হিমালয়, মাঝখানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সমতলভূমি। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ দেশকে উদ্দেশ করে বলেছেন—'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'—বলেছেন ভারতবর্ষ যেন আপন সৌন্দর্যে সমস্ত পৃথিবীর মন ভুলিয়েছে। প্রকৃতিদেবী তাঁর ভাণ্ডার একেবারে উজাড় করে এদেশে ঢেলে দিয়েছেন। একবার ভেবে দেখ, এমন অপর্যাপ্ত সূর্যালোক, এমন সবুজের সমারোহ আর কোথায় গেলে পাবে? নদী তো সব দেশেই আছে, কিন্তু কোথায় এমন গঙ্গা যমুনা, নর্মদা গোদাবরী, কাবেরী তুঙ্গভদ্রা?

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কেন, প্রাকৃতিক সম্পদও কিছু কম নয়। এমন শস্যশ্যামলা দেশ পৃথিবীতে ক'টি আছে? লোকে বলে এদেশের মাটিতে সোনা ফলে। বাস্তবিক এমন ফসল নেই যা এদেশে না জন্মায়। আবার ভূমি যেমন উর্বরা, ভূগর্ভ তেমনি খনিজ সম্পদে ভরা। লোহা, কয়লা, তেল অপর্যাপ্ত। এছাড়া আছে সোনা, তামা, অভ্র, আরো অনেক কিছু। আসামে, মধ্যপ্রদেশে রয়েছে গহন বন। সেখান থেকে আসে দামী দামী কাঠ। দেশে নদী নালারও অভাব নেই। তাই থেকে একদিকে কৃষির জন্যে জল সরবরাহ হচ্ছে, অপর দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন চলছে।

এই সূত্রে আরেকটি কথা বলবার আছে। ভারতবর্ষ এক বিরাট্ দেশ, মহাদেশ বললেও চলে। যেমন বিরাট্ এর বিস্তার তেমনি অফুরন্ত এর বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য এ দেশের মহিমা আরো বাড়িয়েছে। কোথাও প্রচণ্ড শীত, কোথাও দারুণ গ্রীষ্ম। হিমালয়ের কত কত শিখর সংবৎসর বরফে ঢাকা আবার রাজপুতনার মরুভূমিতে যতদূর চোখ যায় কেবল বালি আর বালি—সূর্যতাপে তপ্ত। আবার এমন স্থানও আছে যেখানে শীত গ্রীষ্ম কোনটারই তেমন প্রকোপ নেই ; মনে হবে সারা বছর বসন্তকাল। কিন্তু সব চেয়ে বড় বৈচিত্র্য মানুষের মধ্যে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বিভিন্ন রকম দেখতে—কেউ ধবধবে ফর্সা কেউ মিশমিশে কালো। কোন অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘাকৃতি, কোন অঞ্চলের খর্বাকার। এছাড়া কত রকমের পোশাক, কত রকমের খাদ্য, কত রকমের ভাষা, কত রকমের ধর্ম, কত রকমের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার। আমাদের জাতীয় সংগীত 'জনগণ মন' গানটি তোমাদের জানা আছে। কথাগুলি মনে আছে নিশ্চয়—

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী।

দেখলে তো কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে এদেশে। কেউ যায় মন্দিরে, কেউ মসজিদে কেউ বা গীর্জায়। কিন্তু যেখানেই যাক একই ভগবানের নাম করে।

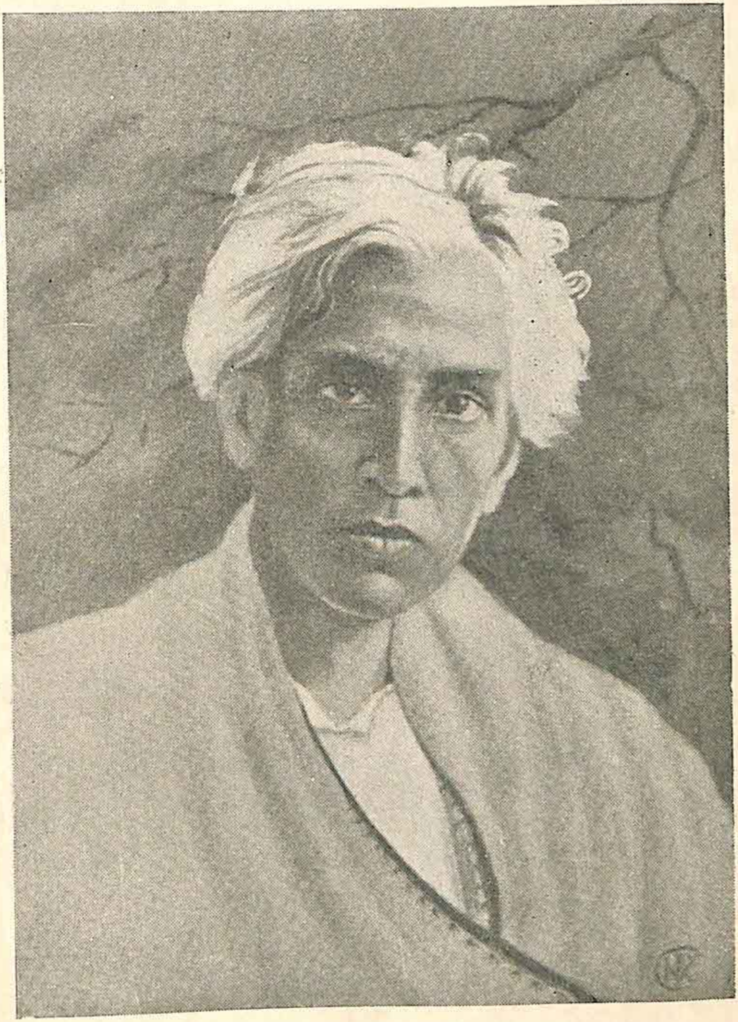
বাইরে থেকে দেখতে গেলে কত পার্থক্য কিন্তু ভাবলে অবাক্ হতে হয় যে এরই মধ্যে একটি সর্বব্যাপী ঐক্যের বন্ধন রয়েছে। তার কারণ আমরা সকল ভারতবাসী একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ সেই অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশটা যে ধারায় চলে আসছে, দেশের ইতিহাসে বড় যা কিছু ঘটেছে, গৌরব করবার মত যা কিছু সামগ্রী দেশে আছে আমরা সকলে তার সমান অংশীদার। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী জানে না এমন মানুষ ভারতবর্ষে নেই। ভুবনেশ্বর, কোণারক, মাদুরার মন্দির, অজন্তা ইলোরার শিল্পকলা, তাজমহলের স্থাপত্য সকল ভারতবাসীর গর্বের বস্তু। সম্রাট্ অশোক আর আকবর বাদশা আমাদের রাজধর্মের আদর্শ।

দেশের ইতিহাস যখন পড়বে তখন বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে এটি একটি সুবৃহৎ পরিবারের ইতিহাস। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আসাম থেকে গুজরাট অবধি সে পরিবার সুবিস্তৃত। পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে পরিবারস্থ সকলকে যেমন মিলে মিশে কাজ করতে হয় দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্যেও ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি মানুষকে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। আগেই বলেছি দেশে কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু সব থেকেও অভাব ঘোচে না যদি দেশের মানুষ অক্ষম হয়। অক্ষম হবার কারণ কি জান? ধর এক পরিবারে সব ক'টি ভাই যদি মিলে মিশে থাকে তবে সবাই তাদের

সমীহ করে চলে। আর যদি মিল না থাকে এক ভাই যদি অন্য ভাই এর কথা না ভাবে তবে সে পরিবারের বাঁধন ক্রমে আলগা হয়ে যায়। দারিদ্র্য দেখা দেয়, নিজেদের মধ্যে খিটিমিটি বাঁধে, পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। দেখে অপরে হাসে, কেউ মান্য করে না। কোন কোন দেশ এবং জাতিও ঠিক এই ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

দেশ সম্বন্ধে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে—দেশটা মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়ে গড়া। দেশকে ভালবাসতে হলে সর্বাগ্রে দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। মনে রাখতে হবে যে দেশের সব চাইতে বড় সম্পত্তি হল দেশের মানুষ। দেশের জনবল একটা মস্ত বড় বল। ভারতবর্ষ আকারে কত বৃহৎ তা তো তোমাদের জানা আছে। জনসংখ্যার দিক থেকেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ-গুলির অন্যতম। তোমরা বোধ হয় জান এদেশে চল্লিশ কোটি লোকের বাস। সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ধরলে দেখা যায় তার প্রায় এক ষষ্ঠাংশ বাস করে ভারতবর্ষে। অর্থাৎ প্রতি ছজন মানুষের মধ্যে একজন ভারতবাসী। গর্ব করবার মতো কথা বটে, কিন্তু শুধু সংখ্যাতেও সব সময় কাজ দেয় না। দেখেছ তো মাত্র পাঁচ কোটি ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর ওপর কত বৎসর রাজত্ব করে গেল। এর এক মাত্র কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে মিল ছিল না। এক জনের বিপদে আরেক জন ছুটে আসে নি। নানা রকম বিভেদের

সৃষ্টি করে আমরা আপন জনকে পর করে রেখেছিলাম। ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, বাঙালী অবাঙালী— এমনি কত রকমের ভেদাভেদ। ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা সবাই ভারত মাতার সন্তান। একতার অভাবে অতীতে অনেক দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হয়েছে। ভবিষ্যতে সে ভুল আর যেন আমরা না করি।



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে



ঠ্যাঙাড়ের কথা। শুনেছে অনেকে, এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেছেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল বেশি। কোন পথই সন্ধ্যার পরে পথিকদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এই দুর্বৃত্তেরা দল বেঁধে পথের ধারে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকতো, হাতে থাকতো বড় বড় লাঠি এবং কাঁচা বাঁশের ভারি ছোট ছোট খেটে। তাকে বলতো পাবড়া। পথিক চলে গেলে তার পা লক্ষ্য করে পিছন থেকে ছুড়ে মারতো সেই পাবড়া। অব্যর্থ তার সন্ধান। অতর্কিতে পায়ে

চোট খেয়ে সে যখন পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়তো তখন সকলে ছুটে এসে দুমদাম করে লাঠি মেরে তার জীবন শেষ করতো। এর ভাবনা-চিন্তা বাচবিচার নেই। এদের হাতে প্রাণ দিয়েছে এমন অনেক লোককে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। ছেলেবেলায় আমার মাছ ধরার বাতিক ছিল খুব বেশি। অবশ্য মস্ত ব্যাপার নয়—পুঁটি, চ্যালা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ। ভোর না হতেই ছিপ হাতে নদীতে গিয়ে হাজির হতাম। আমাদের গ্রামের প্রান্তে হাজা-মজা ক্ষুদ্র নদী, কোথাও কোমরের বেশি জল নেই, সমস্তটা শৈবালে সমাচ্ছন্ন—তার মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁক সেখানেই এইসব ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াতো। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেইগুলি ধরায় ছিল আমার বড় আনন্দ। একলা নদীর তীরে মাছের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন দেখেছি কাদায় শ্যাওলায় মাখামাখি মানুষের মৃতদেহ। নদীর দুই তীরেই ঘন ঘন বন-জঙ্গল, কি জানি কোথাকার মানুষ, কোথা থেকে ঠ্যাঙাড়েরা মেরে এনে এই জনবিরল নদীর পাঁকে পুঁতে দিত। একদিন আমার নিজেরও হয়তো এই দশা ঘটতো; কিন্তু ঘটতে পেলো না। সেই গল্পটা বলি।

আমার বয়স তখন বছর বারো। ও-পাড়ার নয়ন বাগদী আমার ঠাকুরমাকে বলছে, গোটাপাঁচেক টাকা দাও না দিদি-ঠাকরুন, তোমার নাতিকে দুধ খাইয়ে শোধ দেব। ঠাকুরমা নয়নচাঁদকে বড় ভালবাসতেন, জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ টাকার কি দরকার হল, নয়ন? সে বললে, একটা ভাল গরু আনব

দিদি। বসন্তপুরে পিসিমার বাড়ি, পিসতুত ভাই বলে পাঠিয়েছে, চার-পাঁচটি গরু সে রাখতে পারছে না, আমাকে একটা দেবে। কিছু নেবে না জানি, তবু গোটাপাঁচেক টাকা সঙ্গে রাখা ভাল। ঠাকুরমা আর কিছু না বলে পাঁচটা টাকা এনে তার হাতে দিলেন ; সে প্রণাম করে চলে গেল। আমি শুনেছিলাম বসন্তপুরে ভালো ছিপ পাওয়া যায়, সুতরাং নিঃশব্দে তার সঙ্গ নিলাম। মাইল দুই কাঁচা পথ পেরিয়ে গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে বসন্তপুরে যেতে হয়। মাইলখানেক গিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ পিছনে চেয়ে নয়ন দেখে আমি। সে আমাকে দেখে প্রথমটা খুব বকলে, তারপর আমি কি করে এসেছি শুনে হেসে ফেললে। বললে, চলো ঠাকুর, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। এতদূর এসে আর তো ফিরতে পারি নে।

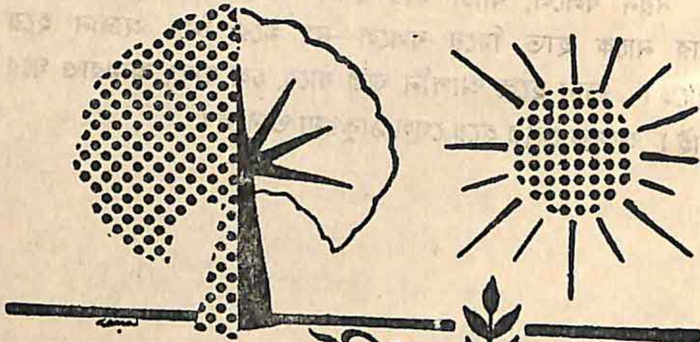
প্রায় দুপুরবেলা দুজনে বসন্তপুরে এসে ওর পিসির বাড়িতে পৌঁছলাম। বাড়ির নিচেই কুন্তী নদী। ছোট, কিন্তু জল আছে—জোয়ারভাঁটা খেলে। স্নান করে এলাম, ওদের বড় বৌ কলাপাতায় চিঁড়ে গুড় দুধ কলা দিয়ে ফলারের যোগাড় করে দিলে। খাওয়া হলে নয়নের পিসি বললে, ছেলেমানুষ চার-পাঁচ কোশ পথ হেঁটে এসেছে, আবার যেতে হবে। এখন শুয়ে একটু ঘুমুক, তারপরে বেলা পড়লে যাবে। তার ছোট ছেলে ছিপ কেটে আনতে গেল।

নয়ন আর আমি দুজনেই পথ হেঁটে এমনি ক্লান্ত হয়েছিলাম যে, আমাদের ঘুম যখন ভাঙলো তখন চারটে বেজে গেছে। বেলার দিকে চেয়ে নয়নদা একটু চিন্তিত হল, কিন্তু

লাঠিটা নাও, বলে সংগৃহীত পাবড়ার একগাছা আমার হাতে দিয়ে বললে—গরু নিয়ে এইখানে একটু দাঁড়াও দাদাভাই, আমি এখুনি দু-এক ব্যাটাকে ধরে আনছি। মিনিট দুই পরে দেখি একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে, পিছনে তার নয়নচাঁদ। কাছে এসেই সে হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরলে। নয়ন টান মেরে তাকে তুলে দাঁড় করালো। এমন তার মূর্তি, দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। মুখে কালি মাখানো, তাতে সাদা সাদা চুনের ফোঁটা দেওয়া। যেমন রোগা তেমনি লম্বা, পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া। তখনও কাঁদছিল। তার গালে নয়ন প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে, যা জিজ্ঞাসা করি সত্য জবাব দে। কজনা ছিলি? তাদের কি নাম, কোথায় ঘর, বল্। লোকটা প্রথমে বলতে চায় না, কিন্তু পিঠে এক গুঁতো খেয়ে সঙ্গীদের নামধাম গড় গড় করে বলে গেল।—মনে থাকবে, ভুলবো না। এখন বল্, বোষ্টমঠাকুর পড়ে গেলে নিজে তুই ক ঘা দিয়েছিলি?—পাঁচ-সাত ঘা হবে বোধ হয়—নয়নচাঁদ দাঁত কড়মড় করে বললে, আচ্ছা, পাঁচ-সাত যা-ই সই। এবার ঠিক তেমনি করে শো—যেমন করে বোষ্টমঠাকুরকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। শুয়ে পড়্—বলেই তার কান ধরে টেনে রাস্তায় বসালে, এবং নিজে সে শোবার পূর্বেই প্রচণ্ড গোটা দুই-তিন লাথি পিঠে মেরে পথের ধুলোর পরে লুটিয়ে দিল। লোকটা লাথি খেয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, আর নড়ে-চড়ে না। প্রাণ ভিক্ষাও চায় নি—একটা কথা পর্যন্ত না।

নয়ন বললে, ব্যাটা মরে গেল নাকি? তখন হেঁট হয়ে তার নাকে হাত দিয়ে বললে—না, মরে নি। অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান হলে আপনি ঘরে যাবে, চল দাদা, আমরাও ঘরে যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল ঠাকুরমা ভাবছে।





উদ্ভিদ রাজ্য

তেজেশচন্দ্র সেন

আমরা যে প্রাণিজগতে বাস করি তার এক ভাগ জন্তুর, এক ভাগ উদ্ভিদের। এদের দুই পৃথক কোঠায় ফেললেও, এক জায়গায় এরা সমান, উভয়েই এরা প্রাণী। উদ্ভিদ্ চলে না এবং কথা বলে না বলে, এই সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না, আমরা তাদের জীব পদবী দিতে ভুলে যাই।

এ কথা সকলেরই জানা আছে, গাছপালাদের আমাদেরই মতো আহার করে বাঁচতে হয়। খাদ্য জোটাতে না পারলেই তারা মারা পড়ে। যাদের প্রাণ আছে তাদের বৃদ্ধিও আছে ও শেষ আছে মৃত্যুতে। গাছপালার মধ্যে একদল আছে যাদের আয়ু কয়েক মাসের বেশি নয়। আবার এমন গাছ আছে দেখা যায়, যারা হাজার দু হাজার বছর বাঁচে।

আলাদা আলাদা করে ধরলে, জন্তুরা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচে, তারপর মরে। কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিদের মধ্য দিয়ে যে প্রাণধারা বয়ে যায়—তার আর অন্ত পাওয়া যায় না। গাছপালারাও ফল-ফুল-বীজের সাহায্যে আপন বংশকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মরতে দিচ্ছে না।

কিন্তু, বাঁচবার ধরনে তফাত দেখি জন্তুর সঙ্গে গাছপালার। বেশির ভাগ জন্তুই চলাফেরা করে আহার সংগ্রহ করে, অধিকাংশ গাছ তা করে না। ডাঙার গাছ দেয় মাটির নিচে শিকড় চালিয়ে। কেউ বা দেয় বহু দূরে, কেউ বা দেয় উপরে উপরে। আহার জোটাতে জন্তুরা পায় বাধা, গাছদেরও বাধা ঘটে। মাটির নিচে যেখানে নুড়ি পাথর আছে, দেয় তারা পথ আটকে। আশপাশ থেকে অন্য গাছের শিকড় এসে ঠেলাঠেলি করে, আবার আহারের ভাগ নিয়েও পাল্লা দিতে থাকে। কিন্তু শিকড় সহজে দমতে চায় না। সুবিধে খোঁজবার জন্য আঁকাবাঁকা পথ নেয়, কখনো যায় পাশের দিকে, কখনো ওঠে উপরে, কখনো নামে গভীরে।

একমাত্র মাটির ভাণ্ডারেই যে গাছের রসদ জমা থাকে, তা নয়। গাছ তার প্রধান প্রাণপদার্থ যোগাড় করে হাওয়া থেকে। আর, তার চাই আলো। সেজন্য গাছের ডালে পাতায় কী কাড়াকাড়ি। বীজ হতে অঙ্কুর মাটি ফুঁড়ে উপরে ওঠে প্রথমেই দেয় আলোর দিকে পাতা মেলে। যেদিকে ছায়া, আলো কম, সেদিকে গাছ কিছুতেই ডাল বা পাতা বের করতে

চায় না। গাছের ডাল বা পাতা সর্বদাই ছড়িয়ে পড়তে চায় চারদিকে যতটা পারে আলো হাওয়া ধরবার জন্যে।

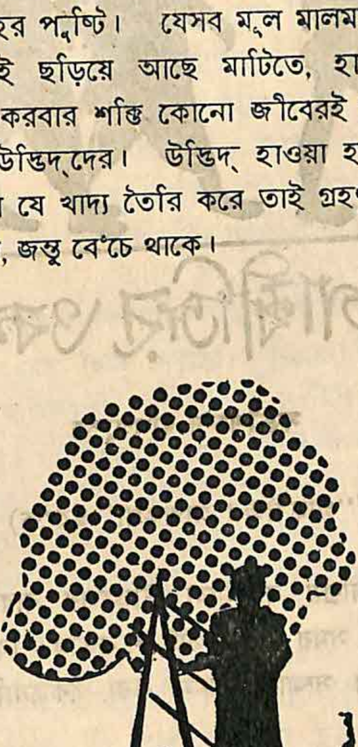
গাছের এই যে বাঁচবার চেষ্টা, আহার যোগাড়ের জন্য এই যে নড়াচড়া—তা অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, গাছ নির্জীব আড়ষ্ট জিনিস নয়, তার মধ্যে বাঁচবার চেষ্টা সব সময়েই কাজ করছে। কোনো কোনো গাছের মধ্যে এই নড়াচড়া খালিচোখেই দেখতে পাওয়া যায়। লজ্জাবতী লতায় একটু জোরে নিশ্বাস ফেললেই, তার পাতা মুড়ে যায়, বোঁটাটি নিচের দিকে নুয়ে পড়ে। আবার কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই পাতা মেলে দিয়ে বোঁটাটি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তেঁতুল, আমলকী, শিরীষ, বাবলা ও এইজাতীয় আরো কোনো কোনো গাছ রাত্রিতে পাতা বুজিয়ে দেয়। শালুক ফুল দিনের বেলায় পাপড়ি বুজিয়ে দেয়, আর রাত্রি হলে মেলে। পদ্মের পাপড়ির ব্যবহার ঠিক তার উলটো—দিনে তা ছড়িয়ে পড়ে, রাত্রে যায় গুটিয়ে।

গাছের পাতায় এক রকম সবুজ পদার্থ আছে, জন্তুর তা নেই। গাছে ও জন্তুতে এই হল প্রধান তফাত। অনেক গাছের ডাল ও গুঁড়ির ছালের রঙও সবুজ। মনসা-জাতীয় গাছের পাতা থাকে না, কিন্তু এদের আগাগোড়া সব দেহটাই সবুজ। এই সবুজ পদার্থের গুণেই উদ্ভিদ্ বেঁচে আছে।

গাছের খাদ্য তৈরী হয় গাছের পাতায়। গাছ মাটি থেকে যে খাবার টেনে নেয় সেসব জিনিস কাঁচা মাল—অর্থাৎ সে-গুলোর রূপান্তর ঘটিয়ে তবেই তার ব্যবহার চলে। এই

কাঁচা মালকে আলোর সাহায্যে খাদ্যে পরিণত করে দেবার কাজ করে গাছের পাতা। পাতার সবুজ পদার্থ, সূর্যকিরণ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে খাবার পরিপাকের সাহায্য করে।

জীবজগতের প্রাণ রক্ষা করছে উদ্ভিদ্। উদ্ভিদ্‌দেহ থেকেই জন্তুদেহের পুষ্টি। যেসব মূল মালমসলায় জীবদেহ তৈরী তা সবই ছড়িয়ে আছে মাটিতে, হাওয়ায়। তাদের খাদ্যে পরিণত করবার শক্তি কোনো জীবেরই নেই। সে শক্তি একমাত্র আছে উদ্ভিদ্‌দের। উদ্ভিদ্ হাওয়া হতে, মাটি হতে, মালমসলা নিয়ে যে খাদ্য তৈরি করে তাই গ্রহণ করে জন্তুদেহ পুষ্টিলাভ করে, জন্তু বেঁচে থাকে।





গান্ধীজির ওকালতি

সতীশচন্দ্র দাশগ‍্ুপ্ত

("গান্ধীজির আত্মকথা" হইতে)

অসত্যের আশ্রয় না নিলে উকিলের ব্যবসায় চলে না, ওকালতি পড়ার সময় এই কথাই শ‍ুনতাম। কিন্তু মিথ্যা বলে পয়সা নেওয়া বা সম্মান অর্জন করা, কোনোটিতেই আমার লোভ ছিল না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এর পরীক্ষা অনেকবার হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি জেনেছি যে বির‍ুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীদের মিথ্যা শেখানো হয়েছে, আর যদি আমি আমার মক্কেল বা

সাক্ষীকে নামমাত্রও মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করি, তা হলেও মোকদ্দমার জিত হয়। কিন্তু আমি সকল সময়ই এই প্রকার লোভ জয় করেছি। আমার অন্তরে সর্বদা এই ভাব থাকত যে যদি মক্কেলের কথা সত্য হয় তবে যেন জিত হয়, যদি মিথ্যা হয় তবে যেন হার হয়। মোকদ্দমার হার জিতের উপর নির্ভর রেখে ফী নির্দিষ্ট করা হত না। মোকদ্দমায় হারলেও আমার পারিশ্রমিক মাত্র নিতাম, জিতলেও তাই নিতাম। অবশেষে এ সম্বন্ধে আমার এমন খ্যাতি রটে গিয়েছিল যে মিথ্যা মোকদ্দমার মক্কেলেরা আমার কাছে আসতই না।

একবার এক মোকদ্দমায় আমার সত্যনিষ্ঠার ভালোমত পরীক্ষা হয়। এটা ছিল আমার সবচেয়ে ভালো মক্কেলের মোকদ্দমা। মোকদ্দমাটি জটিল হিসাব নিয়ে এবং অনেকদিন থেকেই চলছিল। শেষে এর হিসাব সম্বন্ধীয় অংশের সালিসের জন্য কয়েকজন নামজাদা হিসাবরক্ষকের হাতে ভার দেওয়া হল। সালিসের নির্ধারণ অনুসারে আমার মক্কেলেরই জিত হয়। কিন্তু সালিসের হিসাবে একটা ছোট অথচ মারাত্মক ভুল ছিল।

আমি ছিলাম মক্কেলের পক্ষে জুনিয়র উকিল। আমার সিনিয়র উকিলকে ঐ ভুল দেখানো হলে তিনি বললেন "সালিসের ভুল স্বীকার করতে আমার মক্কেল বাধ্য নয়।" আমি বললাম, "ভুল স্বীকার করাই তো সঙ্গত।" সিনিয়র উকিল বললেন, "এমন করলে কোর্ট সমস্ত সালিস রদ করে

দেবেন, এমন আশঙ্কা আছে। কোনো বুদ্ধিমান্ উকিল মক্কেলকে এতখানি বিপদে ফেলে না।"

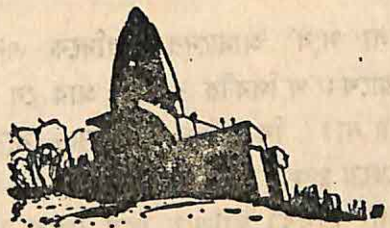
এই কথাবার্তার সময়ে মক্কেল উপস্থিত ছিলেন। আমি বললাম, "মক্কেল এবং আপনার দুজনেরই এই দায়িত্ব নিতে হয়। আপনি স্বীকার না করলেও, কোর্ট ভুল জেনেও যে ঐ নির্ধারণ বহাল রাখবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? আর শুদ্ধ করতে গিয়ে যদি মক্কেলের ক্ষতিই হয়, তা হলেই বা আপত্তি কি?" সিনিয়র উকিল দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "ভুল স্বীকার করার শর্তে আমি উপস্থিত হতে প্রস্তুত নই।" আমি নম্রভাবে বললাম, "যদি আপনি না দাঁড়ান, আর যদি মক্কেল চান, তবে আমিই দাঁড়াতে প্রস্তুত আছি। ভুল স্বীকার না করলে কিন্তু আমার দ্বারা এই মোকদ্দমা চালানো অসম্ভব।" মক্কেলের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আমার স্বভাবও তিনি জানতেন। তিনি বললেন, "ভালো, তা হলে আপনিই আদালতে দাঁড়াবেন। হারা যদি কপালে থাকে, তবে হার হবে। সত্যের দিকেই তো ঈশ্বর আছেন।" আমি স্বীকার করলাম, আমার মক্কেলের নিকট থেকে আমি অন্য উত্তর আশা করি নি।

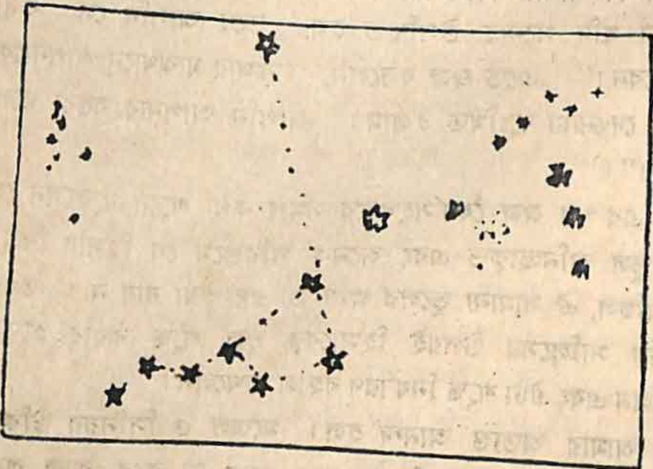
শঙ্কিতচিত্তে আমি বিচারকের সামনে গিয়া দাঁড়ালাম। ঐ ভুলের উল্লেখ করা মাত্রই একজন জজ বলে উঠলেন "এ কি চালাকি নয়" আমি শান্তভাবে জবাব দিলাম, "আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে আপনি সব না শুনেই আমার চালাকি বলে স্থির করলেন!" জজ বললেন, "আমি স্থির করি নি, কেবল আশঙ্কা বোধ করছি।" আমি উত্তর করলাম, "আপনার

আশঙ্কা আমার কাছে দোষী স্থির করার মতোই লাগছে। সব শুনে যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে আপনি সে কথা তুলবেন।'' এতে জজ বললেন, ''কথার মাঝখানে আপনাকে বাধা দেওয়ায় দুঃখিত হলাম। আপনি আপনার বক্তব্য বলে যান।''

এর পর জজ ধৈর্যসহকারে সমস্ত কথা শুনে বুঝলেন যে ঐ ভুল অনিচ্ছাকৃত এবং অনেক পরিশ্রমে যে হিসাব তৈরী হয়েছিল, ঐ সামান্য ভুলের জন্য তা রদ করা যায় না। তখন তিনি সালিসের উপরই হিসাবের ভুল শুদ্ধ করার হুকুম দিলেন এবং ঐটা শুদ্ধ নির্ধারণ বহাল রাখলেন।

আমার অত্যন্ত আনন্দ হল। মক্কেল ও সিনিয়র উকিল সন্তুষ্ট হলেন। ওকালতিতে সত্য ত্যাগ না করে কাজ করা চলে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হল।





নক্ষত্রলোক

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

দিনের বেলা সূর্য আমাদের চারদিকে একটা আলোর পর্দা টাঙিয়ে রাখে। পৃথিবীর বাইরে আর যে কিছু আছে তা দেখতেই দেয় না। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায় : তখন অন্ধকার ছেয়ে প্রকাশ পায় অসংখ্য নক্ষত্র। বুঝতে পারি জগৎটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক দূরে। কিন্তু কত যে দূরে তা শুধু চোখে দেখে ধরতে পারি না, কারণ আমাদের দৃষ্টির সীমাটা খুব বেশি নয়। পৃথিবীতে মোটা-

মূটি কাজ চালানোর জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, দৃষ্টিশক্তির ততটুকু সম্বল নিয়েই আমরা জন্মেছি।

১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম দূরবীন তৈরি করে দৃষ্টির সীমানা অনেক বাড়িয়ে দিলেন। বহু দূরের জিনিস, যা খালি চোখে ঝাপসা দেখায় বা দেখাই যায় না তাকে এই দূরবীনে খুবই স্পষ্ট দেখা গেল। এই দূরবীনের যুগ আসার পরেই মানুষ দূরবীনের শক্তি বাড়িয়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল মহাকাশে তার দৃষ্টির সীমানা। নক্ষত্রলোকের কী যে বিরাট্ চেহারা তা তখন ধরা পড়ল।

আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠল বিশ্বের রূপ। এই রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে একটা জিনিস বিশেষ করে চোখে পড়ে, প্রকৃতি তার চেহারাটাকে এমন ভাবে সাজিয়ে রেখেছে যে মানুষ তার সহজ বোধশক্তির কাঠামোর মধ্যে তাকে অনায়াসে ধরতে পারে। তাই অতিবড়োকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাকে করেছে ছোটো, আর অতি ছোটোকে করেছে অদৃশ্য। যে-সূর্য প্রায় তেরোলক্ষ পৃথিবীর মতো বড়ো, পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে আছে বলে আকাশে তাকে দেখায় ছোটো একখানি থালার মতো। গোটা সূর্য যদি আমাদের খুব কাছে থাকত তাহলে তার সমগ্র রূপ যে কী তা জানতেই পারতাম না। আমাদের তুলনায় যা অতিবড়ো তাকে আমরা যতটুকু জানতে পারি সে দূরের থেকে। সূর্য একটি নক্ষত্র, নক্ষত্রদের মধ্যে আকাশে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। আর যেসব নক্ষত্র রয়েছে বহুদূরে তাদের দেখি আলোর বিন্দুর মতো; অথচ এদের

বেশির ভাগই সূর্যের চেয়ে অনেক বড়ো। বোঝা যায় কী অসীম দূরত্বের মধ্যে এই নক্ষত্রের দল ছড়িয়ে আছে।

এই নক্ষত্রলোকের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে। এদের যে দেখতে পাই তার কারণ আকাশ পার হয়ে নক্ষত্রের আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আলো চলে। এই চলা কিন্তু সাধারণ চলা নয়, এমন চলা জগতের আর কোনো পদার্থের নেই। এত দ্রুত তার গতি যে এক সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার পথ পার হয়ে যায়। ছোটো পৃথিবীর মানুষ আমরা, আলোর এই প্রচণ্ড গতি শুধু অনুভবে বুঝব এতো বড়ো জায়গাতো এখানে নেই। পৃথিবীর পরিধি মাত্র চল্লিশ হাজার কিলো-মিটার, তাই আলোর দৌড়ের কথাটা জানবার সুযোগই হয় না।

সেই সুযোগ ঘটে মহাকাশের বিরাট্ দূরত্বের মধ্যে। আগেই বলা হয়েছে আকাশে সূর্যই আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র; তবু পৃথিবী থেকে দূরত্ব কম নয়, প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার। এই পথটা পেরিয়ে তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় প্রায় আট মিনিটে। কিন্তু মহাকাশের বিরাট্ দূরত্বের পরিমাপে পৃথিবী-সূর্যের ব্যবধান দূরত্বের মধ্যেই গণ্য হয়। সূর্যের পরেই যে-নক্ষত্র আকাশে রয়েছে তার থেকে আলো আসতে লাগে তিন চার বছর। তার চেয়ে যেসব নক্ষত্র দূরের তাদের দূরত্ব অনুসারে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগে, অনেক শত, অনেক হাজার, অনেক লক্ষ বছর।

যে আলো এক সেকেন্ডেই তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ চলে, তার যদি লক্ষ বছর কেটে যায় কোনো নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আসতে তাহলে এই নক্ষত্রটার দূরত্ব যে কত কোটি কোটি কিলোমিটার তা কল্পনাও করা যায় না। সংখ্যা দিয়ে লিখলে বিপুল জায়গা জুড়বে, অঙ্কের বোঝা হয়ে উঠবে দুর্বহ। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকে ঢুকলেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপের মতো শোনায়। তাই নক্ষত্রের দূরত্ব হিসেব করতে বিজ্ঞানীরা আর একটা সংকেত ব্যবহার করেছেন। এক বছরে আলো যতটা পথ চলে, অর্থাৎ প্রায় আট লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি কিলোমিটার তাকে বলা হয় "আলো-বছর", ইংরেজিতে বলে 'লাইট-ইয়ার'। এই আলো-বছরকেই একক ধরে নক্ষত্র-লোকের দূরত্ব বর্ণনা করা হয়।

নক্ষত্রমাত্রই একটি জ্বলন্ত বায়ব-পিণ্ড। এদের মধ্যে অবিরাম চলছে এক তুমুল অগ্নিকাণ্ড। স্বভাবতই একটা প্রশ্ন মনে জাগে। যে-নক্ষত্র আমাদের কাছে থেকে এত দূরে রয়েছে, যার সঙ্গে একমাত্র আলোর যোগ ছাড়া আমাদের আর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই তার ভিতরের খবর পৃথিবীতে বসে পেলাম কী করে। নক্ষত্রের ছড়িয়ে-দেওয়া আলোর মধ্যেই লুকনো রয়েছে তার উপাদান পদার্থ, ওজন, আয়তন, উষ্ণতা ও দূরত্বের খবর। মানুষ এই আলোর বুক চিরে সব খবর আদায় করে নিয়েছে। কি করে এটা সম্ভব হয়েছে তা বুঝতে হলে আলোর প্রকৃতির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় দরকার। এখানে তার বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই এই সত্যটাকে

মেনে নিতে হবে। খালি চোখে যতটুকু দেখতে পাই তা থেকে জানি নক্ষত্রদের মধ্যে কেউবা উজ্জ্বল, কেউবা ম্লান, কেউবা লাল, কেউবা হলদে, কেউবা নীল, আর কেউবা সাদা। কিন্তু এদের ছড়িয়ে দেওয়া আলো পরীক্ষা করে জানা যায় এদের আয়তন, উজ্জ্বলতা, ঘনত্ব ও রঙের প্রভেদ। কেউবা আয়তনে সূর্যের চেয়ে দশকোটিগুণ বড়ো, আবার কেউবা দশলক্ষগুণ ছোটো; কেউবা সূর্যের চেয়ে দশহাজারগুণ বেশী আলো দেয়, কেউবা দশহাজার ভাগেরও কম। কারও বস্তুপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারও অত্যন্ত পাতলা; কারও উপরিতলের উষ্ণতা ত্রিশ হাজার ডিগ্রি, কারও বা তিনহাজার ডিগ্রির বেশী নয়। কারও উজ্জ্বলতা স্থির, কারও বা দীপ্তি একবার বাড়ে একবার কমে।

আকাশে কতকগুলি সাদা রঙের 'বেঁটেনক্ষত্র' আছে যাদের পদার্থের ঘনত্বের কাছে লোহা, তামা, সোনা ও প্ল্যাটিনামের মতো কঠিন ও ভারি জিনিস খুবই হালকা বলে মনে হবে। এমন একটি নক্ষত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে যার ঘনত্ব জলের ঘনত্বের ষাটহাজারগুণ। এর বস্তুপুঞ্জ দিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স যদি ভরতি করা যেত তাহলে তার ওজন হোত পঞ্চাশ-মনের কাছাকাছি, এই ছোটো বাক্সটাকে তুলতেই লাগত বিশ-পঁচিশজন লোক। আর একটি 'বেঁটের' খোঁজ পাওয়া গেছে যে আয়তনে পৃথিবী থেকে ছোটো কিন্তু তার বস্তুপুঞ্জ জলের চেয়ে চারলক্ষগুণ ঘন। এতো ঘন জিনিস কল্পনা করতে বুদ্ধিও হার মানে।

আবার বিপরীত দৃষ্টান্তও রয়েছে লাল রঙের অতিকায় নক্ষত্রগুলিতে। সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে এদের 'দানব-নক্ষত্র' বললেও অত্যুক্তি হয় না। আকাশে আর্দ্রা নামে এক লাল-দানব নক্ষত্র রয়েছে, কালপুরুষমণ্ডলীতে তাকালেই তাকে দেখা যায়। এর দূরত্ব একশোনব্বুই আলো-বছর, আয়তন এতো বড়ো যে কয়েক কোটি সূর্যকে অনায়াসে তার দেহের মধ্যে জায়গা দিতে পারে। আকাশে সূর্যের জায়গায় যদি আর্দ্রা-নক্ষত্রটি থাকত তাহলে পৃথিবীসুদ্ধ আমরা সবাই তার ভিতর ঢুকে যেতাম। বৃশ্চিকরাশিতে জ্যেষ্ঠা নামে এক 'দানব' রয়েছে ; তার দূরত্ব একশো পঁচিশ আলো-বছর আর আয়তন আর্দ্রানক্ষত্রের প্রায় আটগুণ। এসব দানব-নক্ষত্রের বস্তুপুঞ্জের ঘনত্ব এতো কম যে পৃথিবীর কোনো পদার্থের সঙ্গে তার সুদূর তুলনাও হয় না। সাদা রঙের 'বেঁটে' নক্ষত্র ও লাল রঙের 'দানব' নক্ষত্রগুলিকে সাধারণ নক্ষত্রের দলে ফেলা যায় না। মাঝারি আয়তন ও তাপমাত্রা যাদের তারাই হলো সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র, যেমন সূর্য। নক্ষত্রলোকের শতকরা আশিটি নক্ষত্রই এই দলের।

দূরবীনেও দেখা যায় না এমন অনেক নক্ষত্র রয়েছে আকাশে। তাদের খবর পাওয়া গেছে দূরবীনের সঙ্গে ক্যামেরা লাগিয়ে। ক্যামেরার প্লেটে তারা রেখে গেছে তাদের স্থায়ী স্বাক্ষর। এইভাবেই সন্ধান মিলেছে নক্ষত্রের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড় হাজার হাজার জ্যোতিষ্কের ; এদের বলা হয়

'নীহারিকা', ইংরেজিতে বলে 'নেবুলা'। রাত্রের আকাশে খালিচোখে এদের দু-একটিকে দেখতে পাওয়া যায় লেপে-দেওয়া আলোর মতো। এদের মধ্যে কতগুলি সূক্ষ্ম গ্যাসের মেঘের মতো, আবার কতকগুলি অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ। সবচেয়ে দূরের যে-নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে তার কাছে থেকে পৃথিবীতে আলো আসতেই লাগে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর। এ যে কী বিপুল দূরত্ব তা কল্পনাও করা যায় না।





সরস্বতী কুণ্ডী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[আরণ্যক গ্রন্থ থেকে এই অংশটি গৃহীত হয়েছে। লেখক উত্তর বিহারের লবটুলিয়া বন-অঞ্চল স্বচক্ষে দেখে এই অংশে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন।]

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এ রকম জলাশয়কে এদেশে কুণ্ডী বলে। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পায়ের তিন দিকে নিবিড় বন। এ ধরনের বন লবটুলিয়ার অন্যত্র নেই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ জলের কাছাকাছি আছে বলেই হোক

বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্য পুষ্পের ভিড়।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের ওপর কতদিন গিয়ে একা বসে থাকতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসে পাখির কূজন শুনতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করতাম। এখানে যত রকমের পাখির ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখি নেই। নানা রকমের বন্য ফল খেতে পায় বলে এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধার সুযোগ ঘটে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের ওপর লম্বা, গভীরতায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়ে বনের মধ্যে গাছ-পালার ছায়ায় ছায়ায় শুঁড়ি পথ বনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এসেছে—এই পথ ধরে বেড়াতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার ওপর উপুড়-হয়ে-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তে-মিশে যাওয়া শৈলশ্রেণী চোখে পড়ত। ঝির্ ঝির্ করে স্নিগ্ধ হাওয়া বইত, পাখি গান গাইত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যেত।

স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসে পাখির কূজন শুনতে শুনতে মন কত দূরে চলে যেত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের সুবাস ছড়াত বাতাসে,

জলে জলজ লিলির দল ফুটত। কতক্ষণ বসে থেকে সন্ধ্যার পর সেখান থেকে উঠে আসতাম।

সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা। এত পাখিও আছে এখানকার বনে। কত ধরনের, কত রং-বেরঙের পাখি। তাদের উল্লাস-ভরা অবাক-কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুয়ে আছি দেখছে, আমার চারিপাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসে কিচ্-কিচ্ করছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নেই।

পাখিদের এই অসংকোচ চলাফেরা আমার বড় ভাল লাগত। উঠে বসেও দেখেছি তারা ভয় পায় না। একটু হয়ত উড়ে গেল, কিন্তু একেবারে দেশ ছাড়া হয়ে পালায় না। খানিক পরে নাচতে নাচতে বকতে বকতে আবার অত্যন্ত কাছে এসে পড়ে।

এখানেই প্রথম বন্য হরিণ দেখলাম। জানতাম বন্য হরিণ আমাদের মহালের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি। শুয়ে আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠে বসে মাথার শিয়রের দিকে চেয়ে দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে একটা হরিণ। ভাল করে চেয়ে দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণ শাবক। সে আমায় দেখতে পেয়ে অবোধ-বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে—ভাবছে, এ আবার কোন অদ্ভুত জীব!

খানিকক্ষণ কেটে গেল, দুজনেই নির্বাক্, নিস্পন্দ। আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করে, দেখবার জন্য আবার একটু এগিয়ে এল। তার চোখে ঠিক যেন মানব-শিশুর সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরো কাছে আসত কিনা জানি না, আমার ঘোড়াটা সে সময় হঠাৎ পা নেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠতে হরিণ-শিশু চকিত সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্য দিয়ে দৌড়ে তার মায়ের কাছে সংবাদ দিতে গেল।





সুমথনাথ ঘোষ

আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান্ বুদ্ধদেব কপিলাবাস্তু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে ভগবান্ বুদ্ধদেব এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস, মানুষ এক জন্মে কখনও দেবত্ব লাভ করতে পারে না—বহু জন্মের বহু পুণ্যফলে তবে ধীরে ধীরে এই স্তরে উন্নীত হয়। তাই তাঁরা ভগবান্ বুদ্ধের এই অতীত জীবনের বৃত্তান্তগুলিকে জাতক আখ্যা দিয়াছেন।

হাজার হাজার বছর পূর্বে একবার ভগবান্ বুদ্ধ একস্থানে ফেরিওয়ালারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল সেরিবান। ঐ স্থানে সেরিবা নামে আরো একজন ফেরিওয়ালা

ছিল। অর্থে তার এত বেশী লোভ ছিল যে, লোককে ঠকিয়ে অল্পমূল্যের জিনিস বেশীদামে বিক্রি করতো।

কিন্তু সেরিবান ঠিক ঠিক দামে, তার জিনিস বিক্রি করতো। লোককে ঠকাবার কথা কখনো তার মনে কোনদিন আসতো না। তাই সবাই সেরিবানের কাছ থেকে জিনিস কিনতো, সেরিবার কাছে কিনতো না।

এদিকে দিন দিন বিক্রি কমে যাচ্ছে দেখে সেরিবা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লো। সে তখন সেরিবানকে ডেকে বললে, আজ থেকে আমরা দুজনে দুদিকে ফেরি করতে যাবো ; তা না হলে আমরা কেউ লাভবান হতে পারবো না এবং একদিন হয়তো দুজনেরই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

সেরিবান দেখলে, সেরিবা অন্যায় বলে নি। তাই সেইদিন থেকে তারা দুজনে ভিন্ন গ্রামে ফেরি করতে লাগলো। যেদিকে সেরিবান যায়, সেরিবা যায় না। আর যেদিকে সেরিবা যায়, সেদিকে সেরিবান যায় না।

কিন্তু, এইভাবে দিনকতক কাটাবার পর সেরিবা ভাবলো, কাজটা ঠিক হয় নি। সেরিবান হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ করছে। যদি সেরিবান যেখানে ফেরি করে সেখানে সে যেতো তা হলে হয়তো ভাল করতো। তাই আবার একদিন সেরিবানকে সে বললে, কাজ নেই ভাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়ে, আজ থেকে আমরা দুজনে দুরকম জিনিস নিয়ে একই গ্রামে ফেরি করবো। তা হলে দুজনেই নিশ্চয় খুব লাভ করতে পারবো।

কথাটা এবারও সেরিবানের কাছে ভালই মনে হল। সে তাতেই রাজী হল এবং পরদিন থেকে দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে লাগলো।

একদিন দুজনে একটি নদী পার হয়ে বহু দূরবর্তী এক গ্রামে জিনিস বিক্রি করতে গেল। সেরিবা এক রাস্তা ধরলে। সেরিবান আর এক রাস্তা ধরলে, এইভাবে গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তারা জিনিস ফেরি করতে লাগলো।

সেরিবা একটা পুরানো ভাঙা বাড়ির সামনে গিয়ে যেমন হাঁকলো, "মনিহারী জিনিস চাই গো," অমনি একটি ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে তাকে বাড়ির ভেতর ডেকে নিয়ে গেল এবং একটি পুতুল কিনে দেবার জন্য তার ঠাকুরমার কাছে ভয়ানক বায়না ধরলো।

তারা ছিলো বড় গরিব, কিন্তু বুড়ীর নয়নের নিধি এই নাতনীটি। তাই কেমন করে সেই পুতুলটি তাকে কিনে দেবে এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে, ভাঙা সিন্দুকের মধ্যে বহুদিনের একটা পুরানো কৌটো পড়ে আছে। সেইটার বদলে ফেরিওয়ালা যদি পুতুলটি দেয়—এই মনে করে বুড়ী তখনি কৌটোটা বার করে এনে তাকে দেখালে।

সেরিবা দেখামাত্র চিনতে পারলো যে, কৌটোটা সোনার, এবং তাতে হীরা-মুক্তোর কাজ করা রয়েছে। তবে বহুদিন অযত্নে পড়ে থাকার দরুন ধুলো ও ময়লা লেগে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু অত্যধিক লোভের আশায় সে বৃদ্ধাকে বললে,

মা, এর আর কি দাম হবে, এক পয়সা কি দেড় পয়সা। অথচ আমার পুতুলটার দাম চার আনা। কাজেই কৌটোর বদলে কেমন করে পুতুলটা দেবো মা? তার চেয়ে বরং দেড়টা পয়সা নিয়ে কৌটোটা আমায় বিক্রি করে দিন, তাতে আপনার সুবিধা হবে।

বুড়ী বললে, আমার নাতনীর যদি পুতুল কেনা নাই হল তবে দেড় পয়সার জন্য এটা বিক্রি করে লাভ কি? তবু একটা জিনিস ঘরে আছে, থাক।

সেরিবা তখন ভাবলে, এখনি যদি এর দাম আরো কিছু বাড়িয়ে দেই তা হলে বুড়ী হয়তো মনে করবে জিনিসটার দাম সত্যি সত্যিই খুব বেশী। তাই ফেরবার পথে আর একবার এসে মূল্য কিছু বাড়িয়ে দিয়ে কৌটোটা কিনে নিয়ে যাবো; এই মনে করে সে তখনকার মত সেখান থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেরিবানও ফেরি করতে সেই পথে এসে পড়লো। মেয়েটি তাকে দেখতে পেয়ে আবার তাকেও ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে, এবং এবার একজোড়া চুড়ি কিনে দেবার জন্য ঠাকুরমাকে ভয়ানক পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

অগত্যা বুড়ী আবার সেই কৌটোটা এনে তার হাতে দিয়ে বললে, দেখ বাছা, এর বদলে যদি দুগাছা চুড়ি দিতে পার তো দাও—না হলে চলে যাও আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।

সেরিবান সেই কৌটোটা দেখে বুড়ীকে বললে, মা, এ যে অতি মূল্যবান জিনিস, সোনা ও হীরা-মুক্তো দিয়ে তৈরী। এর দাম কমপক্ষে এক হাজার টাকা হবে। আমার কাছে

এখন মোট পাঁচশো টাকা আছে, কাজেই আমি কি করে এটা কিনবো বলুন ?

তিন পুরুষ আগে বুড়ীদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, এবং তখন থেকেই সেই কৌটোটা অযত্নে বাক্সের মধ্যে পড়ে থেকে থেকে অমন ছাতা ধরে গিয়েছিল। তাই বুড়ী মনে করেছিল, বুঝি ওটা পেতলের জিনিস। কিন্তু সৌরিবানের মুখ থেকে ওই কথা শুনে বুড়ী বললে, কিছুক্ষণ আগে একজন ফেরিওয়ালা এসে এর দাম বলে গেল দেড় পয়সা, অথচ এটুকু সময়ের মধ্যে যদি এটা সোনায় পরিণত হয়ে এত মূল্যবান হয়ে থাকে তো সে তোমার হাতের স্পর্শেই হয়েছে। কাজেই তোমার কাছে যা আছে তাই দিলেই আমার যথেষ্ট হবে। তার চেয়ে বেশি আমি চাই না।

তখন সৌরিবান কোমরে বাঁধা পাঁচশো টাকা গুনে দিয়ে তার কাছ থেকে কৌটোটা কিনে নিল এবং সেই চুড়ি দুগাছা মেয়েটির হাতে পরিয়ে দিয়ে একেবারে নদীর ঘাটে গিয়ে হাজির হল।

এদিকে সৌরিবা—সেই আগের ফেরিওয়ালাটি—লোভ সামলাতে না পেরে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে আবার বুড়ীকে ডেকে বললে, আচ্ছা মা, আরো দুপয়সা না হয় বেশী দিচ্ছি, কৌটোটা আমায় দিয়ে দিন।

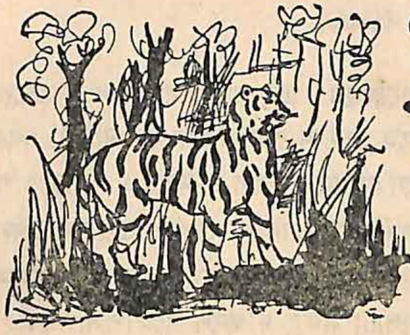
বুড়ী বললে, সে কৌটোটা তো আমার কাছে নেই। এইমাত্র আর একজন ফেরিওয়ালাকে পাঁচশো টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।

'আর একজন ফেরিওয়ালা' বলতেই সেরিবা চমকে উঠলো এবং সে যে সেরিবান ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা বুঝতেও তার দেরি হল না। তাই আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে তখন হায় হায় করতে করতে ছুটলো নদীর দিকে। যদি এখনো তাকে পথে ধরতে পারে, তা হলে পাঁচশো টাকা দিয়ে কোন রকমে তার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নেবে। এটা তার প্রাপ্য। সে আগে দরদাম করে গিয়েছিল।

নদীতে মাত্র একখানি নৌকা খেয়া দেয়। সেরিবানকে নিয়ে সেই নৌকাটা যখন মাঝ নদীতে চলে গিয়েছে, এমন সময় সেরিবা ঘাটে এসে উপস্থিত হল এবং 'নৌকা ভিড়াও, নৌকা ভিড়াও' বলে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে যেমন সেই নদীর কিনারায় ছুটে গেল, অমনি পা ফসকে একেবারে গভীর জলে পড়ে গেল। সে সাঁতার জানতো না। খরস্রোতে নদীর মধ্যে পড়ে যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কেউ তা জানতেও পারলে না। সেরিবান বা মাঝি কারো কানে সে ডাক গিয়ে পৌঁছালো না। তারা তাদের গন্তব্য স্থানে চলে গেল।

এইভাবে লোককে ঠকাতে গিয়ে সেরিবার মৃত্যু হল। আর নির্লোভ সেরিবান কৌটোটা বিক্রি করে বহু টাকা লাভ করলো এবং সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে লাগলো।





সুন্দর বন

নারায়নচন্দ্র চন্দ

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রের তীরে যে বন-অঞ্চল বিরাজিত তা সুন্দরবন নামে পরিচিত। এ বনভূমি দেখতে অবশ্য সুন্দর, কিন্তু এ নাম হয়েছে অন্য কারণে। এখানকার বনে 'সুঁদরি' নামক একপ্রকার কাঠ জন্মে। এ-কাঠ কেবলমাত্র সেই রকম জায়গাতেই জন্মে যেখানে বড় বড় নদীর সঙ্গে পলিমাটি এসে সাগরে পড়ে এবং যেখানে সাগরের লোনা জলের জোয়ার-ভাঁটা খেলে। এই 'সুঁদরি' বন থেকেই হয়ত এ বনের নাম হয়েছে সোঁদরবন বা সুন্দরবন।

দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলা দেশের সুন্দরবনের আয়তন ছিল চার হাজার বর্গমাইল। দেশ যখন বিভক্ত হয় তখন পূর্ব-দিকের অর্ধেকের কিছু বেশী অংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে এবং ষোলশ তিরিশ বর্গমাইল বনভূমি আসে পশ্চিম-বঙ্গের ভাগে। এই সংরক্ষিত বন-অঞ্চল বর্তমানে চব্বিশ-

পরগনা জেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই অরণ্য যেখানে সবচেয়ে দীর্ঘ সেখানে পূবে-পশ্চিমে এর দূরত্ব একশ দশ মাইল, এবং যেখানে সবচেয়ে বেশী চওড়া সেখানে উত্তর-দক্ষিণে এ বন পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত। এই বনের উত্তরে আবাদ-অঞ্চল ; এখানে এখন মানুষের বসতি এবং চাষবাসের কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমে হুগলী নদী, পূর্বে হরিণঘাটা নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

ভূমির প্রকৃতি

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বনের সঙ্গে সুন্দরবনের তফাত এই যে এর মধ্যে বহু নদীনালা, খাল ও খাড়ি রয়েছে। সমগ্র বন-অঞ্চল সমতল ; বড় জোয়ারের সময় সমগ্র বনভূমির ওপর সাগর জল চলে আসে, সাধারণ জোয়ারের সময় বনের নিচু অংশ জলমগ্ন হয়। প্রতিদিন দুবার করে জোয়ার এবং ভাঁটা খেলে। কাজেই ছঘণ্টা পর পর জলস্রোতের গতি পরিবর্তন হয়,—একবার জল সমুদ্র থেকে ডাঙার দিকে প্রবাহিত হয়, আবার সেদিক্ থেকে ফিরে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল উপকূলে প্রায় সাত ফুট উঁচু হয়ে ওঠে এবং নদীনালা ও খাড়ির মুখ দিয়ে ভূমির দিকে বেগে অগ্রসর হয়। উত্তরদিকে নদী ও খাড়িগুলি যেখানে সরু হয়ে গেছে সেখানে জোয়ারের জল অনেকখানি উঁচু হয়ে প্রচণ্ড বেগে ভূমি প্লাবিত করে। বনভূমির ভিতর দিয়ে নিয়মিত সাগরের জল যাওয়া-আসা করে বলে অন্যান্য স্থানের বনভূমির মত এখানে অত বেশী ছোট ঝোপ-ঝাড় বা জঙ্গল জন্মে না।

চব্বিশ-পরগনা জেলার মতই সুন্দরবনের ভূমি পলিমাটি দিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশ এক সময় সাগরের তলায় ছিল ; উত্তর ভারত ও হিমালয়-অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ মাটি গঙ্গার জলের সঙ্গে এসে হাজার হাজার বছর ধরে জমা হয়েছে, তার ফলে এই অংশ সমুদ্র সমতল থেকে ক্রমে উঁচু হয়ে উঠে মানুষের বসতের উপযোগী ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মাটি খুঁড়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সুন্দরবন অঞ্চলে পলিমাটির স্তর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট গভীর।

এক সময় গঙ্গানদী এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হত ; এখন যে-কয়েকটি বড় নদী উত্তর থেকে দক্ষিণমুখে সুন্দরবন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সেগুলি এই প্রাচীন গঙ্গানদীরই খাত। গঙ্গার প্রধান ধারা ক্রমশ পুব মুখে সরে গেছে। এখন ইছামতী নদীর ভিতর দিয়ে ভাগীরথীর জল-প্রবাহ রায়মঙ্গল নদীতে গিয়ে পড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে নদী-গুলির জল লবণাক্ত বলে পানের অযোগ্য। আবাদী জমিতে এই জল প্রবেশ করলে ফসল নষ্ট হয়। এই লবণাক্ত জল ঠেকানোর জন্যে আবাদী জমির পাড় দিয়ে 'ভেড়ি' অর্থাৎ বাঁধ দেওয়া হয়। রায়মঙ্গল, হরিণভাঙা, কালিন্দি প্রভৃতি যে কটি নদী সুন্দরবনের মধ্যে প্রবাহিত রয়েছে তাদের ভিতর দিয়ে এখন আর গঙ্গা বা পদ্মার জলধারা বয়ে আসে না, ঐ অঞ্চলের বৃষ্টির জল এই নদীগুলিতে এসে পড়ে এবং এগুলি কার্যত নদীর খাড়িতে পরিণত হয়েছে।

গাছপালা

বনভূমির ওপর দিয়ে লবণাক্ত সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা খেলে বলে এখানে যে ধরনের উদ্ভিদ্ জন্মে অন্য বনভূমির উদ্ভিদ্ থেকে তা একেবারে পৃথক্ ধরনের। বনের উত্তরাংশে দেখা যায় সুঁদ্রি কাঠের গাছ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে এর পরিমাণ কম। নদী ও খালের পাড়ে ও কাদাময় ভূমিতে কেওড়া ও বাইন গাছ। কেওড়া গাছ সাধারণত ত্রিশ-চল্লিশ ফুট দীর্ঘ হয়ে থাকে। এছাড়া নদীতীরে গর্জন, কাঁক্‌রা ও ওরা গাছ জন্মে। কেবল খাল ও নদীর পাড়েই খল্‌সি নামক ঝোপ-গাছ দেখা যায়। আর আছে গোলপাতা ও হাতাল গাছের ঝোপ। গোলপাতার গাছ সাধারণত ভিজে কাদামাটিতেই ভাল হয়। আমরা যদি সুন্দর-বনের উত্তর দিক্ থেকে দক্ষিণে সাগরের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাই তার প্রথম দিকে চোখে পড়বে সুশ্রী সুঁদ্‌রি গাছ। এ-গুলি উচ্চতায় প্রায় সত্তর ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর সঙ্গে দেখা যাবে পাশুর, গেঁওয়া, কাঁক্‌রা প্রভৃতি গাছ। দক্ষিণ দিকে সুঁদ্‌রির চেয়ে গেঁওয়া গাছের সংখ্যাই বেশী এবং আরো দক্ষিণে যেখানে জল বেশী লবণাক্ত সেখানে গরাণ গাছেরই প্রাধান্য।

সুন্দর বনের গাছপালার একটি বৈশিষ্ট্য হল যে বড় গাছগুলির শিকড় মাটির ওপরে ছইঞ্চি থেকে দেড় ফুট পরিমাণ সোজা বেরিয়ে থাকে, দেখে মনে হবে বনের মধ্যে কতকগুলি খোঁটা পোঁতা রয়েছে যেন। এর ভিতর যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্র আছে তার সাহায্যে গাছ বাইরের বাতাস

টেনে নেয়। এই শিকড়গুলো গাছের নাকের কাজ করে বলে এগুলিকে বলা হয় নাসিকামূল।

পশুপক্ষী

সুন্দর বনের সব চেয়ে প্রধান জীব হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এই বাঘ দেখতে যেমন সুশ্রী, এর প্রকৃতিও তেমনি ভয়ংকর। নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত মাপে সুন্দর বনের বাঘ দশ থেকে সাড়ে দশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। সুন্দরবন ছাড়া অন্যান্য বনের বাঘ স্বভাবতই মানুষ-খেকো নয়, আহত হলে বা অন্য কোন কারণে তার স্বাভাবিক শিকার ধরতে অক্ষম হলে সে বাঘ মানুষ ধরে খেতে শুরু করে। কিন্তু সুন্দর বনের বাঘ জন্ম থেকেই মানুষ-খেকো। আর আছে বুনো শূকর, চিতল হরিণ ও বানর। কেওড়া গাছের পাতা এবং ফল চিতল হরিণের অতি প্রিয় খাদ্য। এরা গেঁওয়া ও সুঁদরি গাছের কচি শিকড় ও গরাণের চারাও খায়। হরিণ, শূকর ও জোয়ার জলে আসা মাছ খেয়ে সুন্দর বনের বাঘ জীবনধারণ করে। গোলপাতা, কাঠ ও মধু সংগ্রহ করার জন্যে এবং মাছ ধরতে যারা সুন্দর বনের ভিতর যায়, অসতর্ক হলেই বাঘের হাতে তারা প্রাণ হারায়। সুন্দরবনের নদী-নালায় মাছ আছে প্রচুর, এবং সেই জন্যে কুমিরও আছে প্রচুর। এখানকার কুমির অত্যন্ত হিংস্র। কেবল উত্তর কানাডার নদী ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এমন ভীষণ প্রকৃতির কুমির দেখা যায় না।

সুন্দরবনে তিনটি 'অভয়ারণ্য' আছে। এখানে কোন প্রকার পশুপাখি হত্যা করা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই তিনটি স্থান হল লাথিয়ান দ্বীপ, হ্যালিডে দ্বীপ ও সজনাখালি। লাথিয়ান দ্বীপ ও হ্যালিডে দ্বীপে প্রচুর চিতল হরিণ, বন্য শূকর ও বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। সজনাখালি যেন পাখিদের স্বর্গরাজ্য। আমাদের দেশের বিভিন্ন রকম জলচর পাখি ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে নানা জাতের বিদেশী পাখি কিছুকাল বসবাস করার জন্যে এখানে আসে। বড় বক, কৃষ্ণকণ্ঠ সারস, সাপ-পাখি, সবুজ বক, পেলিক্যান প্রভৃতি পাখি এই অভয়ারণ্যে নির্ভয়ে ঝাঁক বেঁধে বাস করে।

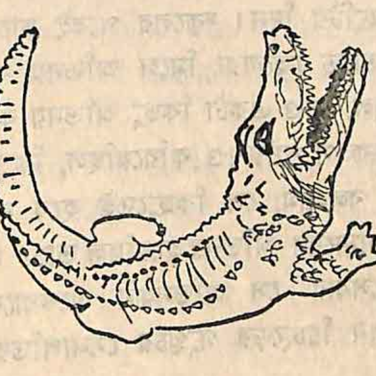
বনজ সম্পদ

সুন্দরবন থেকে যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা পাই তার মধ্যে প্রধান হল কাঠ, মধু ও মোম। সুঁদরি কাঠ থেকে উৎকৃষ্ট ঘরের খুঁটি এবং ছাতার ডাঁট তৈরী হয়, ধুঁদল গাছ থেকে কাঠের কলম ও পেন্সিল তৈরির উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় বলে কলকাতায় এর বেশী চাহিদা। বাইন্ কাঠ থেকে তক্তা পাওয়া যায়। গেঁওয়া কাঠ নরম, এর তক্তা দিয়ে প্যাকিং বাক্সের কাঠ তৈরি হয়। দেশলাই-কাঠি তৈরি করতেও গেঁওয়া কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গরাণ, বাইন ও খল্সী কাঠের জ্বালানী হিসেবে খুব চাহিদা আছে।

সুন্দরবনের অধিকাংশ গাছের বাকলের রস থেকে সুন্দর রং তৈরি করা যায়। চামড়া রং করার রঞ্জক পদার্থ হিসেবে এর ব্যবহার আছে। স্থানীয় অঞ্চলের জেলেরা এই সব

গাছের ছালের রস দিয়ে নৌকা ও জাল রাঙিয়ে নেয়। সাধারণ লোকেদের ঘরের ছাউনির জন্যে গোলপাতা সুন্দরবন থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ অরণ্য থেকে বছরে প্রায় ছ হাজার মন মধু এবং প্রচুর মোম সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয়।

সুন্দরবনকে অন্য কথায় সমুদ্রবন বলা চলে, কারণ সমুদ্রের লবণাক্ত জলে-ধোয়া মাটিতেই এ বনের সৃষ্টি। নদীর মিঠা জলের সঙ্গে যে কোমল পলিমাটি এসে সমুদ্রের কূলে জমা হতে থাকে, ক্রমে তারই ওপর নানা উদ্ভিদ্ বেড়ে উঠে সমুদ্রের হাত থেকে ভূমি দখল করে নেয়। এইভাবে উদ্ভিদ্-রাজ্য ক্রমশ সাগরের দিকে প্রসারিত হতে থাকে। উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের সম্পর্ক, অরণ্য তাই মানুষের কাছে প্রিয় ও আকর্ষণীয়। অরণ্য শুধু বন্য পশুপক্ষীর আশ্রয়স্থলই নয়, মানুষের ভূমির রক্ষাকারী এবং সম্পদের ভাণ্ডার। যুগ যুগ থেকে সুন্দরবনের সঙ্গে তাই বাঙালীর নিবিড় সম্পর্ক।





দেবদূত

সুকুমার রায়

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্রসমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল, সেও একটা কিছু অভিনয় করে। একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না। সেই তো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া

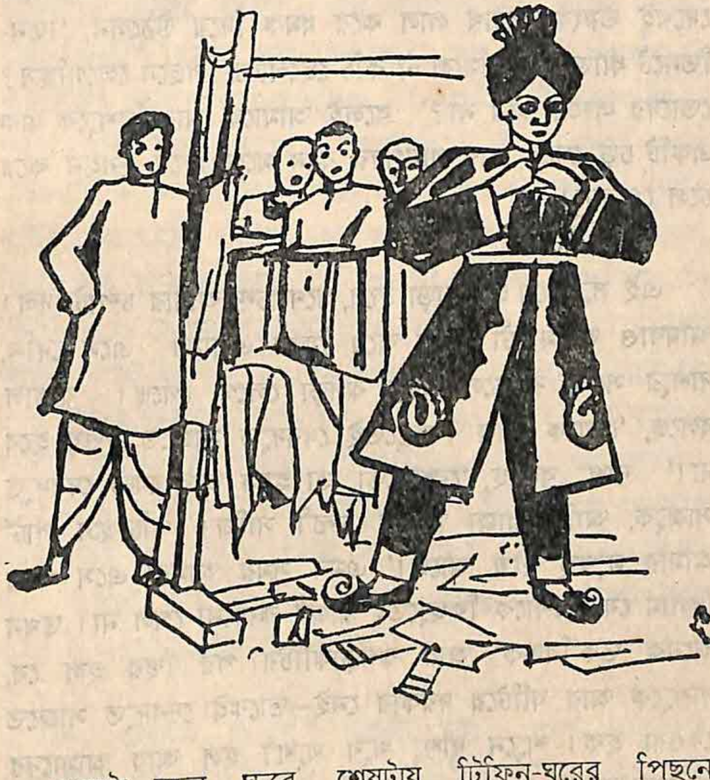
করে তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে বলল, 'সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার—' দাশুর তখন 'তবে আয় সম্মুখ সমরে' —বলে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতেই পারল না, মাঝে থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার 'খোল তলোয়ার' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি 'দাঁড়া, দেখছিস না বক্‌লস্ আটকিয়ে গেছে,' বলে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ার খুলে দিলাম, তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি,' তখন দাশুর বলবার কথা ছিল, 'নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি'। কিন্তু দাশুটা তা না বলে, তার পরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিব কেটে 'ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম' বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে বলে উঠলাম, 'না, সে কিছুতেই হবে না।' বিশু বলল, 'দাশু এক্‌টিং করবে? তা হলেই চিত্তির!' ট্যাপা বলল, 'তার চাইতে ভজু মালিকে ডেকে আনলেই হয়!' দাশু বেচারা প্রথম খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে

গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাসের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে—তাই তাকে দেবদূতের পার্ট দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানা রকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশু ভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিরে? তুই এখানে কি করছিস?' দাশু বলল, 'বাঃ, পোশাক পরব না?' আমি বললাম, 'পোশাক পরবি কিরে? তুই তো আর এক্‌টিং করবি না।' দাশু বলল, 'বাঃ, খুব তো খবর রাখ? আজকে দেবদূত সাজবে কে জান?' শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল; আমি বললাম, 'কেন, গণশার কি হল?' দাশু বলল, 'কি হয়েছে তা

গণশাকে জিজ্ঞেস করলেই পার।' তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসে নি। অমনি রামপদ, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।



সারাটা স্কুল ঘুরে, শেষটায় টিফিন-ঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে

নিয়ে চললাম। গণশা কাঁদতে লাগল, 'না, আমি কক্ষনো এক্‌টিং করব না, তা হলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।' আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ংকর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তিন-তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস? তোদের লজ্জা করে না?' বলেই আমাকে আর বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান মলে দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন।

এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে, গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, 'তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।' দাশু বলছে, 'বেশ তো, তা হলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিংবা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা পার্ট আমার মুখস্থ হয়ে আছে।' এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম যে গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই—তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হক। শুনে দাশু খুব খুশী হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল, 'আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তা হলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।'

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করে নি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা 'দেবতা বিমুখ হলে মানুষে কি পারে?' কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচটা লাইন জুড়ে দিল! আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, 'তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা করো সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ?' এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরী প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশী হয় নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, 'বারবার মহারাজে আশিস করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।' বলতেই

হঠাৎ কোত্থেকে 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া' বলে, এক গাল হাসতে হাসতে দাশু একেবারে সামনে এসে উপস্থিত! হঠাৎ এ রকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলল, আমরা সকলে কি রকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম—অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু খুব সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, 'বলে যাও কি বলিতেছিলে।' তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, দাশুকে কি যেন বলবার জন্যে যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু, 'চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে, এই হতভাগা'—বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—'এ রাজ্যেতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা' ইত্যাদি —নিজেই গড়গড় করে বলে গিয়ে 'যাও সব নিজ নিজ কাজে' বলে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে, সব বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর ঝুপ করে পর্দা নেমে গেল।

আমরা সব রেগেমেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, 'হতভাগা, দ্যাখ্ দেখি সব মাটি করলি অর্ধেক কথাই বলা হল না'। দাশু বলল, 'বা, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।' আমি বললাম, 'তুই কেন মাঝখানে এসে সব গোল বাধিয়ে দিলি?

তাই তো সব গুলিয়ে গেল।' দাশু বলল, 'রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে? তা ছাড়া, তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল?' রামপদ বলল, 'ওকে ধরে ঘা দু-চার লাগিয়ে দে।' দাশু বলল, 'লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কি না।'





উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা

দশরথকে যখন ফিরিয়ে আনা হল, তখনও অযোধ্যার অনেক লোক রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছিল। তারা কিছুতেই ফিরতে চাইল না। তাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁদের গায়ে জোর নেই, মাথা কাঁপে, তবুও তাঁরা যাবেনই। তাঁদের কষ্ট দেখে রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা রথ থেকে নেমে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললেন। ব্রাহ্মণরা বললেন, "বাছা রাম, আমরা তোমার সঙ্গে যাব।"

এইভাবে তাঁরা তমসা নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়েছে। কাজেই সেখানে রাত্রিতে থাকবার আয়োজন হল।

ভোরে উঠে রাম দেখলেন যে অযোধ্যার লোকেরা তখনও ঘুমাচ্ছে। তখন তিনি চুপি চুপি সুমন্ত্রকে উঠিয়ে বললেন, "চল এইবেলা আমরা চলে যাই।" সুমন্ত্র রথ সাজিয়ে আনলেন, কিন্তু রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাতে চড়ে আর বেশী দূর গেলেন না। খানিক পরেই তাঁরা রথ থেকে নেমে সুমন্ত্রকে বললেন, "তুমি রথখানি উত্তর দিক্ থেকে ঘুরিয়ে আনো।" শুধু রথ হালকা বলে পথে কিনা তার দাগ পড়বে না, তাই রাম শুধু রথখানা ঘুরিয়ে আনতে বললেন। তিনি জানতেন যে ঐ রকম করলে আর অযোধ্যার লোকেরা রথের চিহ্ন দেখে তাঁদের খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই তাঁরা পথ ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন, আর সুমন্ত্র শুধু রথখানা কিছু দূর ঘুরিয়ে এনে অন্য এক জায়গা থেকে আবার তাঁদের তিনজনকে তুলে নিলেন।

এদিকে তমসা নদীর তীরে সেই লোকগুলি জেগে দেখল যে রাম নেই। তখন তারা এই বলে কেঁদে অস্থির হল—"হায় হায়, কেন ঘুমোলাম? আমাদের ভাগ্যে কি এই ছিল? রাম কি শেষে এই ভাবেই আমাদের ফেলে চলে গেলেন?" কাঁদতে কাঁদতে তারা রথের চিহ্ন দেখে খানিক দূর গেল। কিন্তু তার পরেই রথ কোন্ দিকে গিয়েছে আর কিছু বুঝতে পারল না। কাজেই তখন নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে তাদের অযোধ্যায় ফিরে আসতে হল।

রথ সমস্ত দিন চলে সন্ধ্যাকালে শৃঙ্গবের নগরের কাছে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হল। সেখানে একটি বেশ ইঙ্গুদী

গাছ দেখে রাম বললেন, "এই গাছ তলায় আজ আমরা থাকব।"

এ জায়গার রাজার নাম গুহ। তিনি রামের বন্ধু। রাম এসেছেন শুনবামাত্রই গুহ তাড়াতাড়ি অনেক লোকজন আর ভাল ভাল খাবার জিনিস নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রামের থাকবার জন্যে সুন্দর বিছানা, ঘোড়ার জন্য ঘাস, কিছুই আনতে তিনি বাকি রাখেন নি। তাঁর ইচ্ছা যে রামকে তাঁদের রাজা করে সেইখানেই রাখেন।

রাম আদরের সহিত তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করে বললেন— "ভাই, তোমার ভালোবাসাতেই আমার যারপর নাই সুখ হয়েছে। কিন্তু তোমার জিনিস আমি কি করে নেব? আমায় যে তপস্বীর মতন ফলমূল খেয়ে থাকতে হবে। আমাদের কিছুরই দরকার নেই; কেবল, ঘোড়াগুলিকে দুটি ঘাস দিতে বল।" কাজেই গুহ রামকে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। রাম সীতা জল মাত্র খেয়ে গাছতলায় শুয়ে রইলেন।

রাত্রিতে রাম ঘুমালেন, কিন্তু লক্ষ্মণ জেগে পাহারা দিতে লাগলেন। তাই দেখে গুহ মনের দুঃখে বললেন,—"রাজপুত্র. আমরাই জেগে বন্ধুকে পাহারা দেব, আপনি ঘুমান।" লক্ষ্মণ বললেন,—"দাদার এই দুঃখের সময় আমি কেমন করে ঘুমোব? এর পরে বাবা আর বেশীদিন বাঁচবেন না। তখন মা কৌশল্যা আর সুমিত্রাও নিশ্চয়ই মরে যাবেন।" লক্ষ্মণের আর গুহের ঘুম হল না সমস্ত রাত্রি তাঁদের কেঁদেই কাটল।

পরদিন সকালে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়ে আর গুহের কাছে

বিদায় নিয়ে রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা নৌকোয় গঙ্গা পার হলেন। বুড়ো সুমন্ত্রের কি আর অযোধ্যায় ফিরে যেতে পা চলে? রামের সঙ্গে যাবার জন্যে তিনি কতই না মিনতি করলেন। কিন্তু রাম বললেন,—"তুমি যদি অযোধ্যায় ফিরে না যাও তবে কৈকেয়ী মনে করবেন আমি বুঝি বনে যাই নি। তাহলে বাবাকে তিনি বড়ো কষ্ট দেবেন। তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরে যাও।" সুতরাং সুমন্ত্র আর রামের সঙ্গে যেতে পারলেন না। তিনি একদৃষ্টে রামের দিকে চেয়ে রইলেন। যখন আর রামকে দেখতে পেলেন না, তখন তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।





ধর্মব্যাধ

ক

পূর্বকালে কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদ অধ্যয়ন করতেন। একদিন তিনি এক বৃক্ষমূলে বসে বেদ পাঠ করছেন, এমন সময় ঐ বৃক্ষের শাখা থেকে এক বক তাঁর গায়ে মলত্যাগ করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তার দিকে দৃষ্টি-পাত করা মাত্র বক প্রাণত্যাগ করল। বকের মৃত্যুতে কৌশিক বিশেষ দুঃখিত হলেন। নিজের ক্রোধের জন্যও তাঁর অনুতাপ হল।

সেকালে বিদ্যার্থীরা বৃত্তির জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করত। একদিন কৌশিক গ্রামে প্রবেশ করে এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা চাইলে, ঐ গৃহস্থের পত্নী "ভিক্ষা আনছি" বলে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। ভিক্ষা দিবার জন্য ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করছেন, এমন সময়ে গৃহস্বামী পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। পতিব্রতা গৃহিণী তখন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দিয়েই স্বামীর পরিচর্যা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ব্রাহ্মণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি লজ্জিতভাবে তাঁর কাছে ভিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ সরোষে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলে কেন? তখনই কেন বিদায় করলে না?" ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখে পতিব্রতা তাঁকে শান্ত করবার জন্য বললেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার স্বামী ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন, আমি এতক্ষণ তাঁরই সেবা করছিলাম।" ব্রাহ্মণ বললেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলে মনে কর না, কেবল স্বামীকেই গুরু বলে মনে কর, তুমি গৃহস্থধর্মে থেকেও ব্রাহ্মণের অবমাননা কর; এ অত্যন্ত অনুচিত।" পতিব্রতা উত্তর করলেন, "মহাশয় ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন। আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমার মতে পতি সেবাই প্রধান ধর্ম, স্বামী সকল দেবতার মধ্যে প্রধান। আপনি আমার প্রতি ক্রোধে দৃষ্টিপাত করছেন; কিন্তু আমি বক নই। আমি অবিচলিত ভক্তি সহকারে পতির সেবা করি। আপনি বেদপাঠ করেন, আপনি শুচি ও ধর্মজ্ঞ, কিন্তু বোধ হয়

প্রকৃত মর্ম আপনার জানা নেই। যদি ধর্ম সম্বন্ধে আপনার কোনো সংশয় থাকে, তবে মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। সে ব্যক্তি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বদা পিতা-মাতার সেবায় মনোযোগী। সে আপনাকে ধর্মের কথা বলবে। আপনি আমার বাচালতা মার্জনা করবেন।''

ব্রাহ্মণ বললেন, ''আমি তোমার কথায় অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আমার ক্রোধের উপশম হয়েছে। তোমার তিরস্কার-বাক্য আমার হিতকর হল। তোমার মঙ্গল হোক। আমি চললাম।''

পতিব্রতা নারীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কৌশিক ধর্ম-ব্যাধের সন্ধানে চললেন।

খ

বহু গ্রাম ও নগর অতিক্রম করে কৌশিক রাজর্ষি জনকের রাজধানী মিথিলা নগরে উপস্থিত হলেন। তিনি মিথিলার অপূর্ব শোভা, অতুলনীয় সম্পদ্ ও সুগভীর শান্তি দেখে খুব আনন্দিত হলেন। ধর্মব্যাধের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে অবশেষে তিনি সেই সাধুপ্রকৃতির ব্যাধকে মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করতে দেখলেন। মাংস ক্রয় করবার জন্যে ব্যাধের সম্মুখে বহু ক্রেতার সমাগম ; কৌশিক এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের আগমন মনে মনে অনুভব করে ধর্মব্যাধ এসে বলল, ''মহাশয়, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার সব কুশল তো? আমাকে কি করতে হবে আদেশ

করুন। সেই পতিব্রতা মহিলা আপনাকে মিথিলায় আসতে বলেছেন, এবং আপনি যে কারণে এসেছেন, তা আমি জানি। এদেশ আপনার অপরিচিত। অতএব আপনার আপত্তি না থাকলে আমার গৃহে পদার্পণ করুন।"

এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ব্রাহ্মণ ঐ ব্যাধের সঙ্গে তার গৃহে গেলেন। সেখানে ব্রাহ্মণ সুখে উপবেশন করে বললেন, "এই মাংস বিক্রয় কর্ম তোমার অযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।" ব্যাধ বলল, "মহাশয়, ধর্মানুসারে কুলোচিত কাজই করে থাকি। আমি বৃদ্ধ ও গুরুজনদের সযত্নে সেবা করি, সর্বদা সত্য কথা বলি, কারও কুৎসা বা নিন্দা করি না, কারও প্রতি ঈর্ষা পোষণ করি না। যথাসাধ্য সৎপাত্রে দান করি। অতিথি এবং ভৃত্যদের আগে খাইয়ে নিয়ে পরে নিজে আহার করি। সবিনয় আচরণ করে সকলকে তুষ্ট করি; কখনও পরের অনিষ্ট চিন্তা করি না। অপ্রিয় ঘটনা ঘটলেও বিচলিত হই না, অর্থকষ্ট উপস্থিত হলে হতাশ হই না এবং ধর্ম লঙ্ঘন করি না।"

"আমি স্বধর্ম বিবেচনা করে নিজ কার্যের অনুষ্ঠান করি, কারণ স্বকর্ম পরিত্যাগ করলে অধর্ম হয়। যে ব্যক্তি স্বকর্মে নিরত, তাকে ধার্মিক বলা যায়; প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ব্যক্তিই যশস্বী ও মান্য হয়। সজ্জনগণের কুলধর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, লোককে ক্লেশ না দিয়ে নিজের নিজের জীবিকা নির্বাহ করা উচিত। এতে চিত্ত প্রসন্ন ও নির্মল হয় এবং লোকও ধর্মাত্মা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।"

ব্যাধ এইভাবে ধর্ম ব্যাখ্যা করলে ব্রাহ্মণ প্রীত হয়ে তাকে বললেন, "হে ধর্মাত্মা, তুমি যা যা বললে সে সমস্তই সত্য। ধর্ম বিষয়ে তোমার অজানা নেই।"

গ

ব্যাধ বললেন, "আমি যে ধর্মানুষ্ঠান করে সিদ্ধিলাভ করেছি, তা একবার প্রত্যক্ষ করুন। আপনি গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে আমার পিতামাতাকে দর্শন করুন।"

ব্যাধের কথা অনুসারে ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলেন যে ব্যাধের পিতা ও মাতা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে, উত্তমরূপে আহার করে সন্তুষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে বসে আছেন। পিতামাতাকে দেখা মাত্র ধর্মব্যাধ ভক্তিভরে তাঁদের প্রণাম করল। তাঁরা বললেন, "আমরা তোমার ব্যবহারে প্রীত হয়েছি। ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন।"

ব্যাধ তখন সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাঁদের কাছে নিবেদন করল। তাঁরা সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করলে ব্রাহ্মণও তাঁদের প্রতিসম্ভাষণ করে কুশল প্রশ্ন করলেন।

ধর্মব্যাধ বলল, "এঁরা আমার পিতামাতা। এঁদের দেবতার মত বিবেচনা করে আমি সতত এঁদের তুষ্টি বিধান করি। এঁদের ধর্মস্বরূপ মনে করে সব সময় শুশ্রূষা করি। গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে নিত্য এইরূপ ধর্ম পালন করা কর্তব্য।"

ধর্মব্যাধের নিকট থেকে ধর্ম বিষয়ে এইরূপে মহামূল্য উপদেশ পেয়ে ব্রাহ্মণ তাঁদের নিকট বিদায় নিলেন। পরে বাড়িতে ফিরে অধিকতর ভক্তিসহকারে তিনি নিজের পিতা-মাতার সেবা করতে লাগলেন।





নারায়ণ চন্দ্র চন্দ

পাখিদের দেশ ভ্রমণ

কাক, বক, ঘুঘু, প্যাঁচা, বুলবুল, শালিক, ছাতারে, ফিঙে প্রভৃতি পাখিরা বার মাসই আমাদের দেশে বাস করে। কিন্তু এরকম পাখিও অনেক আছে যারা সারা বছর আমাদের দেশে থাকে না। হাঁস, কাদাখোঁচা, গুড়গুড়ে, চকাচকি, চাহা, বটের, ধোবিন ইত্যাদি অনেক পাখিই প্রতি বৎসর কয়েক মাসের জন্যে আমাদের দেশে বাস করে। অগ্রহায়ণ মাসে যেসব বুনো হাঁস ঝাঁকেঝাঁকে এসে খাল বিল ও নদীতে চরে বেড়ায় তারাও বারোমাস বাংলাদেশে থাকে না ; সমস্ত শীত কালটা এদেশে থেকে

একটু গরম পড়লেই তারা যে ঠাণ্ডা দেশ থেকে এসেছিল সেখানে উড়ে যায়। তোমরা হয়তো ভাবছ, এইসব পাখি সিমলা, দার্জিলিং বা শিলং পাহাড়ের জঙ্গলে বেড়াতে যায়। কিন্তু তা নয়, এদের মধ্যে কেউ সাইবেরিয়া, কেউ তিব্বত, কেউ বা হিমালয়ের উঁচু জায়গায় চলে যায় এবং সেখানে ডিম পেড়ে ও বাচ্চাদের পালন করে গ্রীষ্মকালটা কাটিয়ে দেয়। তারপরে যেই বেশী শীত পড়ে অমনি তারা উত্তর ভারতে এসে দেখা দেয়। পাখিদের এইরূপ দেশভ্রমণ মজার ব্যাপার নয় কি? এদের কেউ কেউ সাত আট হাজার মাইল দূর থেকে আসে এবং মাটি থেকে চার পাঁচ মাইল ওপর দিয়ে চলে, অথচ রাস্তা ভোলে না।

আমাদের দেশে ভ্রমণকারী পাখির সংখ্যা কম। য়ুরোপের নানা দেশে যখন এরকম পাখিরা যাওয়া-আসা করে, তখন পাখিতে পাখিতে আকাশ ঢেকে যায়। দিনরাত্রি তারা উড়ে চলে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে সোজাপথে আসবার সময় হয় তো ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে মারা যায়; কতক আবার জাহাজের আলো দেখে সেখানে মাথা ঠুকে মরে। কিন্তু তথাপি তারা ভ্রমণে ক্ষান্ত হয় না। দেশবিদেশে অনেক লোক আছেন, যাঁরা সমস্ত বৎসর ধরেই পাখিদের আনাগোনা পরীক্ষা করেন। তাঁরা বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষা করে দেখেছেন, এক-একরকম পাখি বৎসরের এক-একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশে এসে দেখা দেয়, এবং এক-একটা নির্দিষ্ট দিনে বিদেশ-যাত্রা করে। আমরা

যেমন পাঁজিপুথি দেখে যাত্রা করি এদের যাওয়া-আসা যেন সেই রকম। কেবল এই নয়, একদল হাঁস এ বৎসর যে পুষ্করিণীতে এসে চরে বেড়াল, বছরের পর বছর তারা ঠিক সময়ে সেই পুষ্করিণীতে আসতে ভুল করে না। পাখি-দের পায়ে আংটি ও নাকে নথ লাগিয়ে চিহ্নিত করে এটা বারবার পরীক্ষা করা হয়েছে। আশ্চর্য নয় কি?

বড় বড় শহরে যাতে লোকের দিক্‌ভুল না হয় তার জন্যে বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে। সেগুলি দেখে লোকে চলাফেরা করে। জাহাজগুলি যাতে ঠিক পথে চলে ঠিক জায়গায় যেতে পারে তার জন্যে জাহাজে কত যন্ত্রপাতি ও ম্যাপ রাখা হয়। তবুও কখনো কখনো জাহাজ বিপথে গিয়ে পাহাড়ে ঠেকে ও ডুবে মারা যায়। ছোট পাখিদের কাছে যন্ত্রপাতি থাকে না এবং দেশের ম্যাপও থাকে না, তবুও তারা কেমন করে পাঁচ হাজার, দশ হাজার মাইল পথ ঝড়ের মধ্য দিয়ে, কখনো বা রাত্রির অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলে ঠিক জায়গায় ঠিক দিনে এসে উপস্থিত হয়, তা বাস্তবিকই বোঝা যায় না।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। দেশে খাবার না পেলে মানুষ কি করে, তোমরা দেখনি কি? তখন তারা বিদেশের ভাল জায়গায় গিয়ে আড্ডা করে এবং সেখানে চাষ-আবাদ করে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। তাই অনেকে মনে করেন

সাইবেরিয়া প্রভৃতি খুব ঠাণ্ডা দেশ শীতকালে যখন বরফে ঢাকা পড়ে যায় তখন সেখানে খাবার না পেয়ে পাখিরা পেটের জ্বালায় নিজের দেশ ছেড়ে দূরের গরম দেশে আসে এবং পেট ভরে খাবার খায়। তারপরে যখন সেইসব জায়গা গরম হয়ে পড়ে, তখন তারা আবার নিজেদের দেশে ফিরে সেখানে ডিম পাড়ে ও সন্তান পালন করে। দেশে গিয়ে ডিম পাড়া ও সন্তান পালন করার ইচ্ছাটাও বড় কম তাগিদ নয়।





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ম্যানেজারবাবু

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারী সেরেস্তার 'পুণ্যাহ', খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারী মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশী—যে খাজনা দেয় সেও, আর যে খাজনা বাক্সতে ভরতি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্‌রার করা হয় না। খুব ধুমধাম, পাড়া গেঁয়ে সানাই অত্যন্ত বেসুরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় পরে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই পুণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাবু ঠিক করলেন, তিনি স্নান করবেন দুধে। চারিদিকে সমারোহ দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল; তিনি তো সামান্য লোক নন।

সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া দুধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর স্নান। নাম বেরিয়ে গেল চারিদিকে ; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশীমনে বাসার রোয়াকে বসে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, ব্রাহ্মণের ছেলে লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে, বললে, হুজুর আপনার নিমক তো খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেকদিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হুকুম করুন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জসিম মণ্ডল চর মহলের প্রজা ; তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা। ফসল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আট্‌কাত। দায়ে পড়ে জসিমের দুই জমিদারেরই খাতায় আর দু জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফসল সামলাতে হত। যে ম্যানেজার দুধে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জলিধানের ফসল কাটবার সময় আসছে—এটা চরের বিশেষ ফসল। চরের জমির জল নেমে গেলেই কৃষাণ পলি-মাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফসল গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো, ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফসল বেদখল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই

উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তুমি। ম্যানেজার তখনও দুধের স্নানের গুমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জসিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্য পক্ষের লোক হল্লা করে এল. মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

মিশির যতবড় সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যখন তাকে ঘেরাও করলে সে গুটিসুটি মেরে বসে সবাইকে আট্‌কাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে।

মিশির বললে, নিমক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক ; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা—শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপরপক্ষ সড়কি চালাল। একটা এসে বিঁধল মিশিরের পায়ে।

অপরপক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন এবার ক্ষান্ত দে, ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা সড়কি এসে বিঁধল তার পেটে, এটা হল

মরণের মার। পুলিসের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির সড়কি টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিস এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্য, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিলুম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দুধের স্নানের খ্যাতি—এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যখন তখন প্রাণ দেওয়া—এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু দুধে স্নান!





হাম্বিরের রাজ্যলাভ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিল্লির বাদশা মহম্মদ খিলজীর হয়ে মালদেব তখন চিতোরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন। চিতোর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে কৈলোরের কেল্লা। হাম্বির লছমী-মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে, লোক যেমন ঠাকুর দর্শন করে তেমনি চিতোর দর্শন করতেন।

সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশ-পটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়ালে দেবমন্দিরের সোনার চুড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত।

একদিন দেওয়ালির পুজো। সন্ধ্যাবেলা হাম্বির এসে মাকে বললেন, "মা, দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এস।"

রানীমা হেসে বললেন, "আচ্ছা, তুই এত বড় হলি, তবু মায়ের সঙ্গে তামাশা করা রোগটা তোর এখনও গেল না? এই মাঠের মধ্যে দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি? এ কি তোর চিতোর—যে ঘরে ঘরে লোকে আলো দেবে?"

"দেখবে এসো না, মা" বলে হাম্বির লছমীরানীকে নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠলেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা, কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে ছিল। যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন। রানীমা অবাক্ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন।

হাম্বির হেসে বললেন, "মা, কি চমৎকার বাহার দেখেছ! কিন্তু এ দেওয়ালি তো দেবতাদের—এখন একবার কৈলোরের দেওয়ালি—আমার দেওয়ালির আলোটা কেমন হয়েছে এদিকে দেখ দেখি!"

রানীমা চেয়ে দেখলেন—কৈলোরের কেল্লার চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে আলো জ্বলছে! লছমীরানী অবাক্ হয়ে হাম্বিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "এই জনমানবহীন কৈলোরে এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এলো?"

হাম্বির বললেন, "ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ, এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া।" রানীমা বললেন, "এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে আমদানি করলি?"

হাম্বির বললেন, "শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে শুধু প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলীও আমদানি করেছি। ওই দেখ কুমোরপাড়ায় মশাল জ্বলছে ; যাত্রা শুরু হল। ওই শোন, তাম্বুলিপাড়ায়



ঢোল বাজছে ; এখনই সঙ বার হবে। ওই যে মহাজনপটিতে নহবত বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ মা, হাম্বির-তালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন!"

লছমীরানী বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য! এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস দেখি! আমি বলি বুঝি তুই বসে বসে কেবল ঘুম দিস। ভিতরে ভিতরে তোর এত বুদ্ধি!"

হাম্বির বললেন, "তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে। লক্ষ্মীপুর কেমন নাম?"

রানীমা বললেন, "আরে না না, ও যে বাঙালী রকম শোনাচ্ছে। আমি একটি ভালো নাম সন্ধান করছি। শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ। তুই আর দিনকতক সবুর কর।"

দুজনে যখন এই কথা হচ্ছে, সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বিরের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রুপোর পাতে-মোড়া নারিকেল এনে লছমীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন।

রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে— "আমার কন্যা কমলা—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন। আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়ি নি।"

রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, "দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন! এটা আজ দেওয়ালি পুজোর কাজে লাগবে।"

হাম্বির বললেন, "বেশ ফলটি; কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকেই আমার লোভ পড়েছে। এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকেই দাও।"

রানী হেসে বললেন, "তা বেশ, তোমাকেই দেওয়া গেল। কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে। যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এসো ; আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি।"

রানী পুজোয় গেলেন। হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "মহারানা, সভায় চলুন, সমস্ত খুলে বলব।"

বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দূত চিতোরে ফিরে গেল। এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্যোগ চলতে লাগল। যত বুড়ো বুড়ো রাজপুত সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন—"মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে। মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনমতেই উচিত নয়।" রানীর হুকুমে পাঁচ শ' রাজপুত সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন। লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন, "বৎস, মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন।" কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর। কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল!

কিন্তু মালদেব—যাঁর কন্যা আজ মেবারের অধীশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী হতে চলেছেন, তিনি কোথায়! কেল্লার

দরজার একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল। মঙ্গল-শাঁখ নেই, কন্যাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোনো নির্জন পুরীতে হাম্বির প্রবেশ করলেন।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বিরের কানের কাছে বললেন, "মহারানা, যেন কেমন কেমন ঠেকছে! মালদেবের লক্ষণ ভালো নয়! আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় নি।"

হাম্বির বললেন, "নিজের কেল্লায় নিজে প্রবেশ করব, তার আবার ভয়টা কি? চলে এস—"

সেই সময় ফটকের এক কোণ থেকে মালদেব এসে বললেন, "মহারানা আমারও সেই আশা ছিল, আপনি নিজের ঘরে আসছেন, তার জন্যে আবার অভ্যর্থনাই বা কি, বাজনাবাদ্যিই বা কেন?"

মন্ত্রী বললেন, "মালদেব, তুমি কি জান না, রাজপুতদের নিয়ম আছে বিবাহের রাত্রে ফুলের কেল্লা দখল করে তবে কন্যাকর্তার বাড়িতে বর প্রবেশ করেন? তোমার কন্যার সখীরা সে আয়োজন করেন নি কেন?"

মালদেব বললেন, "মন্ত্রী, আমি কন্যার পিতা বটে, কিন্তু বাড়ি আমার কোথা? এটা যে মহারানার নিজেরই কেল্লা! নিজের ঘরে নিজে মহারানা এসে প্রবেশ করছেন, সেখানে আমার কন্যার সখীরা এসে তাঁকে বাধা দিতে সাহস পাবে কেন?"

মন্ত্রী একটু হেসে বললেন, "দেখছি, বাদশাহের মজলিসে আনাগোনা করে আপনার কুসংস্কার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন চলুন, বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করুন। লছমীরানীর হুকুম, আজ রাত্রেই বরকন্যা নিয়ে আমরা কৈলোরে ফিরে যাব।"

হাম্বিরের পিতা-পিতামহ যে রাজসভায় বসে রাজত্ব করতেন, সেই ঘরে হাম্বিরকে নিয়ে মালদেব যখন উপস্থিত হলেন, তখন হাম্বিরের বুকের ভিতরটায় কেমন যে করে উঠল তা বলা যায় না।

হাম্বিরের সঙ্গে পাঁচ শ' রাজপুত সেই সিংহাসনকে নমস্কার করে যেমন উঠে দাঁড়ালেন অমনি সেই অন্ধকার ঘর যেন আলো করে কমলকুমারী সখীদের সঙ্গে এসে হাম্বিরের গলায় পদ্মফুলের মালা দিলেন।

কতদিন পরে চিতোরের কেল্লায় আর একবার মঙ্গল-শাঁখ বেজে উঠল! চিতোরের গড় বড় বড় তালা-বন্ধ ঘর নিয়ে এতদিন শূন্য পড়ে ছিল, আজ সেই শাঁখের শব্দে পাঁচ শ' রাজপুতের তলোয়ারের ঝনঝনায় আর একবার যেন লোকে লোকারণ্য বোধ হতে লাগল। যেন তার আগেকার শ্রী আবার ফিরে এলো!

সেইদিন থেকে দুই বৎসর না যেতে সত্যসত্যই হাম্বির এসে চিতোরের কেল্লা দখল করে নিলেন। দিল্লির নবাব মহম্মদ খিলজীর কাছে এ খবর পেঁছিতে গেল মালদেবের

ছেলে বনবীর। তার আশা ছিল, মালদেবের পরে সেই চিতোরে বসে রাজত্ব করবে। তাই সে মহম্মদ খিলিজীর সঙ্গে পাঠান ফৌজ নিয়ে চিতোরের দিকে আসতে লাগল।

লছমীরানীর সঙ্গে কমলকুমারীকে, আর এক বছরের রাজকুমার ক্ষেতসিংহকে, আর একবার কৈলোরের কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়ে হাম্বির যুদ্ধে গেলেন।

বাঘ যেমন হরিণের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি রাজপুতসৈন্য পাঠান ফৌজের উপর গিয়ে পড়ল। সেবারে মহম্মদ খিলিজীকে আর দিল্লির মুখে ফিরে যেতে হল না। হাম্বির তাঁর দুই পায়ে শিকল দিয়ে চিতোরের কেল্লায় এনে তাঁকে বন্ধ করলেন। বনবীরেরও সেই দশা। কমলকুমারীর ভাই বলে সে-যাত্রা হাম্বির তাকে প্রাণে না মেরে বন্দী করে কৈলোরে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

হাম্বির থাকেন কৈলোরে, আর চিতোরে কড়া পাহারার মধ্যে থাকেন দিল্লির বাদশা মহম্মদ খিলিজী। এক মাস, দু মাস, তিন মাস যায়, হাম্বির আর চিতোরে যাবার নামগন্ধ করেন না। একদিন লছমীরানী তাঁকে ডেকে বললেন, "তুই কি পাঠান বাদশাকে চিতোর ছেড়ে দিলি নাকি? যেখানে তোর রাজসিংহাসন, সেই চিতোর ছেড়ে কৈলোরে এসে বসে থাকা তো আর সাজে না। তোর রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসবার ইচ্ছে নেই কি?"

হাম্বির বললেন, "মা, চিতোরের সিংহাসনে বসতে হলে কি চাই, তা জানো? ভবানী-মায়ের হাতের খাঁড়াখানি যতদিন

না সন্ধান করে পাওয়া যায় ততদিন তো রাজা হওয়া যাবে না!"

লছমীরানী বললেন, "লোকে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস ভবানীর খাঁড়া এখনও চিতোরেই আছে। কেবল চিতোরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সেই খাঁড়াখানি যত্ন করে সন্ধান করেন।"

সেদিন হাম্বির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন, "ভবানীর খাঁড়া উদ্ধার করে তবে অন্য কাজ।"

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আকাশে মেঘ করে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, হাম্বির ও কমলকুমারী দুজনে লুকিয়ে চিতোরের কেল্লায় এসেছেন। গ্রামবাসী চাষাচাষীর সাজে, কমলকুমারী পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন, আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটিগুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেইদিকে। এই অমাবস্যার রাত্রে ঝড়ে জলে ঘোর অন্ধকারে কমলকুমারী



হাম্বিরকে নিয়ে মহাশ্মশানের ভিতরে এসে উপস্থিত হলেন। চোখে কিছু দেখা যায় না। কেবল একদিক থেকে ঝরঝর করে

একটা শব্দ আসছে—যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝরনা পড়ছে।

যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল, সেইদিক দেখিয়ে কমলারানী হাম্বিরকে বললেন, "ও ঝরনার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকান্ড বটগাছ, তারই পাশ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে। সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে পদ্মিনী-রানী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। ওই সুড়ঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারুণীদেবীর মন্দির। শুনেছি সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে। আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানীর খাঁড়া ঝুলছে। আমি অনেকবার সেই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গিয়েছি, কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয় নি।"

হাম্বির বললেন, "তুমি সুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চল ; সেই বটগাছের তলায় তোমাকে রেখে আমি ভিতরে যাব"।

হাম্বির কমলারানীকে দুই হাতে তুলে ধরে জলের উপর দিয়ে হেঁটে সেই বটগাছের দিকে চলেছেন।

সেই বটতলায় কমলারানীকে বসিয়ে রেখে হাম্বির অন্ধকারে দুই হাত বাড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভেতরে নেমে চললেন। দুদিকে পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে জল পড়ছে। একটু আলো নেই। একটু শব্দ নেই। সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না। নীল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাম্বির একা চলেছেন।

সেই অন্ধকূপের ভিতর হাম্বির চারিদিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। নিচে পথ নেই, উপরে পথ নেই, আশেপাশে

পাথরের দেওয়াল, তারি মাঝে স্তূপাকার ছাই, চলতে গেলে পা বসে যায়।

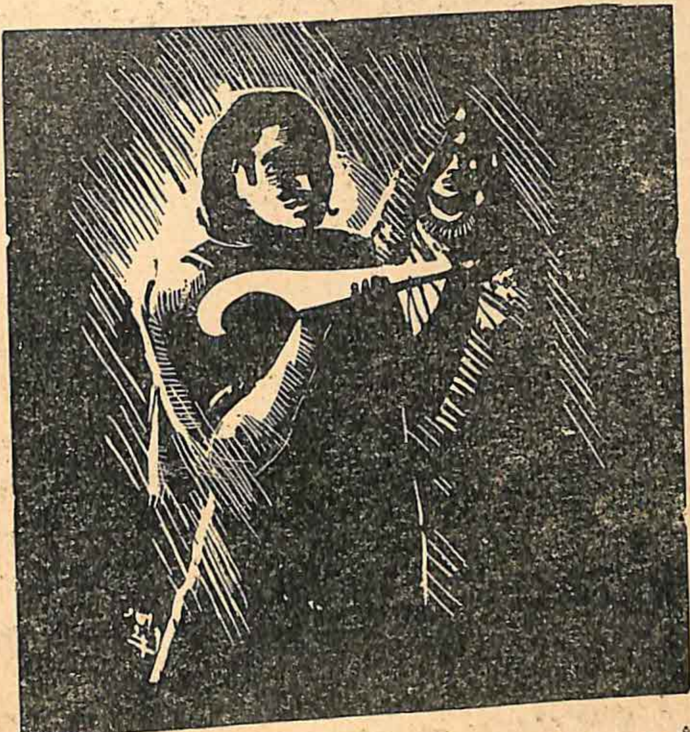
কতক্ষণ হাম্বির সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এমন সময় পাথরের দেওয়ালের উপর থেকে শুনলেন, শাঁকঘণ্টার শব্দ আসছে! দেখতে দেখতে হাম্বিরের চোখের সামনে খানিকটা পাথরের দেওয়াল দু ফাঁক হয়ে সরে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে হাম্বির দেখলেন, গেরুয়া কাপড়, রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাঁচজন ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন। অনেক দূরে কারুণীদেবীর সোনার মূর্তি আগুনের আলোয় ঝকঝক করছে।

হাম্বির নির্ভয়ে কারুণীর মন্দিরে যেখানে ভৈরবীরা বসে রয়েছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। হাম্বিরকে দেখে ভৈরবীরা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন, "কে রে তুই! কি চাস্?"

হাম্বির নির্ভয়ে বললেন, "আমি এসেছি, যা আমার তাই চাইতে। মা-ভবানী বাপ্পাকে যে খাঁড়া দিয়েছিলেন, সে খাঁড়া এইখানে আছে, আমি তাই চাই। তারই জন্য আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন—আমি চিতোরের রানা হাম্বির!"

ভৈরবীরা হাম্বিরের কথায় উত্তর না দিয়ে আগুনের উপর সেই লোহার কড়াখানার দিকে দেখিয়ে দিলেন। হাম্বির ছুটে গিয়ে যেমন সেই কড়াখানার ভিতর হাত দিয়েছেন অমনি কোথায় সে আগুন, কোথায় সে কড়া, কোথায় বা সে ভৈরবীর দল! হাম্বির দেখলেন, ভবানীর খাঁড়া হাতে তিনি কমলারানীর

কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাম্বির ভবানীর খাঁড়া হাতে যেদিন চিতোরের রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন, সেদিন সমস্ত রাজস্থানে জয়জয়কার পড়ল।



লছমীরানী হাম্বিরকে সিংহাসনে বসিয়ে উজলা গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন, তাঁর সেই ছেলেবেলার ঘরে, নদীর পারে খেতের ধারে।



ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্ ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পালকি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা চামড়ার আধ ঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়াআসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো

অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে শেমিজ, পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি; তার মানে, লজ্জা-শরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পেঁাছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার শোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো বা কাঁচা-শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে, আর আমরা তার কানের কাছে চিৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ'; সে যতই হাঁ-হাঁ করে দু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্ট দেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক্। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাশ এসে জ্বালিয়ে যেত রেঁড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্ বুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত মাস্টার মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মূর্খ হয়ে থাকবার মত বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্খড়ির আব্রু-দেওয়া, ওপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকী সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সবচেয়ে বদমেজাজী, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা বাদাম গাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'-টা

তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি—তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নিচে পা রাখলে পা সুড় সুড় করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁকে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাল্গুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নিচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেঁতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মত, পা দুটো উলটো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ির ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত।

মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়া-গাঁয়ের সবুজ-ছায়াপড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকলেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।



ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রীবের ওড়ার শিক্ষা



['চিত্রগ্রীব' একটি পোষা পায়রার নাম। লেখক শ্রীধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানে ছোটদের উপযোগী ইংরেজি বই লিখে যশস্বী হয়েছেন। 'চিত্রগ্রীব' তাঁর বিখ্যাত শিশুপাঠ্য উপন্যাস Gay-Neck' -এর বাংলা অনুবাদ। আমেরিকায় এই বইটিকে শ্রেষ্ঠ শিশু-উপন্যাস হিসেবে নিউবেরি পুরস্কার দেওয়া হয়। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অপর বিখ্যাত বই হল— Jungle Beasts and Men, Kari, the Elephant, Hari, the Jungle Lad.]

পাখি হয়ে জন্মালেও চিত্রগ্রীবের ওড়ার শিক্ষা খুব সোজা হয় নি। মানুষের ছেলেপুলে জল ভালবাসে, তবুও তারা কত ভুল করে, কত জল গিলে তবে সাঁতার শেখে। আমার পায়রার বেলাও তেমনি। ডানা খুলতে তার একটু ভয় ভয়

করত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আমাদের ছাদের উপর বসে থাকত, আকাশের বাতাস তার চার পাশে বয়ে যেত, তবুও তাকে ওড়ার নেশা ধরাতে পারত না। আমাদের ছাদের বর্ণনা দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ছাদের চারধারে পাকা পাঁচিল চোদ্দ বছরের ছেলের মত উঁচু। এই বাধা থাকায়, ঘুমের ঘোরে কেউ চলে বেড়ালেও চারতলার ছাদের উপর থেকে পড়বার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রীষ্মের রাতে আমরা প্রায় সকলেই ছাদের উপর ঘুমোতাম।

প্রতিদিন সেই পাকা পাঁচিলের উপর চিত্রগ্রীবকে বসিয়ে দিতাম। বাতাসের পানে ফিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেখানে বসে থাকত—ব্যাস্, ঐ পর্যন্ত। একদিন ছাদের উপর কতকগুলো পায়রা-মটর ছড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে সেগুলো খেতে ইঙ্গিত করলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল। আমার দিক থেকে ফিরে সে আবার মটরগুলোর পানে নিচু হয়ে দেখতে লাগল। কয়েকবার সে এরকম করল। শেষ পর্যন্ত যখন নিশ্চিত বুঝতে পারল যে ঐ সুখাদ্যগুলি আমি তার মুখে তুলে ধরব না, তখন সে পাঁচিলের উপর বেড়াতে লাগল, আর মাঝে মাঝে হাত দুই নিচে মটরগুলোর পানে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখতে লাগল। মন স্থির করতে না পেরে প্রায় পনের মিনিট যন্ত্রণা ভোগ করার পর সে লাফিয়ে পড়ল। দুই পা ছাদের উপর যেই লাগা অমনি বন্ধ ডানা ছড়িয়ে বিলকুল খুলে গেল, তারই উপর ভর দিয়ে মটরগুলোর উপর সে তাল সামলে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

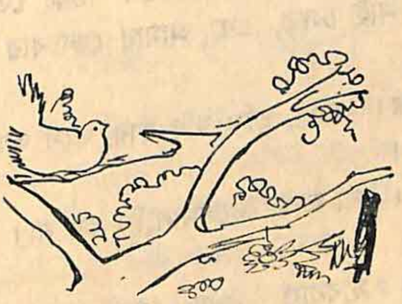
সেই সময় নাগাদ তার পালকের রঙের বদল চোখে পড়ল। একটা অনির্দিষ্ট ফিকে নীলের জায়গায় তার সর্বাঙ্গে যেন সমুদ্রের রঙ্ ফুটে উঠল। হঠাৎ একদিন সকালে দেখি তার গলা ঝিক্‌মিক করছে—সাতরঙা রামধনুকের মত। এইবার সব সেরা কাজ ওড়ার সময় এল। প্রথম শিক্ষা দেবে তার বাবা-মা, আমিও সাধ্যমত শেখাতে লাগলাম। প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্য আমি তাকে কব্জির উপর বসাই, তারপর হাত-খানা অনেকবার উপর-নিচ করে দোলাতে থাকি। সেই অস্থির দাঁড়ের উপর আপনাকে স্থির রাখবার চেষ্টায় তাকে ঘন ঘন ডানা খুলতে ও বন্ধ করতে হয়। এতে তার উপকার হয়, কিন্তু আমার শিক্ষার ওখানেই শেষ। হয়তো তোমরা জানতে চাইবে এত তাড়া কিসের? ওড়ার শিক্ষায় সে পিছিয়ে আছে, তার বয়সে সাধারণত পায়রা উড়তে পারে; তারপর আষাঢ় মাসে বর্ষার শুরু, তখন তার পক্ষে অনেক দূর ওড়া সম্ভব হবে না। তাই যত শীঘ্র সম্ভব তাকে দিক্ চেনাবার চেষ্টা করছিলাম।

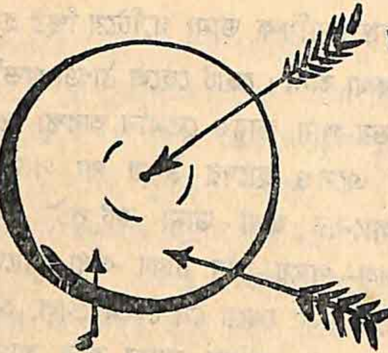
যাই হোক, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হবার অনেক দিন আগেই তার বাপ ছেলের শিক্ষার ভার নিল। সেদিন সারা দিন দখিনা বাতাসে শহরের উপরকার বাতাস তপ্ত হতে পারে নি। বাতাস সেই সবেমাত্র থেমেছে। আকাশ স্বচ্ছ নির্মল, উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির মত। চারিদিক এমন পরিষ্কার অনেক দূর পর্যন্ত শহরের গৃহচূড়া দেখা যাচ্ছে। আরো দূরে মাঠ বাগান শস্যখেত নজরে পড়ছে। বেলা প্রায় তিনটার সময়

চিত্রগ্রীব ছাদের পাকা পাঁচিলের উপর রোদ পোয়াচ্ছিল। তার বাপ উড়ে বেড়াচ্ছিল, নেমে এসে ঠিক তার পাশে এসে বসল। ছেলের পানে কেমন এক অদ্ভুত রকমে সে চাইল, তার মানে যেন—"বলি, কুঁড়ের সর্দার, বয়স ত প্রায় তিন মাস হল, এখনো ওড়বার সাহস হয় না! তুই কি, বল্ দেখি—পায়রা না কেঁচো?" কিন্তু গাম্ভীর্যের অবতার চিত্রগ্রীব কোন জবাব দিল না—স্থির হয়ে বসে রইল। দেখে বাপের অসহ্য বোধ হল, সে পায়রার ভাষায়, বক্‌বক্-কুম্ করে ছেলেকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। বকুনি এড়াবার জন্য চিত্রগ্রীব যতোই সরে বসে, বাপও ততই এগিয়ে যায় ডানার ঝাপটা দিয়ে, বক্‌বকানিও থামে না।

চিত্রগ্রীব কেবলই সরে সরে বসতে লাগল, বুড়ো কিন্তু তাতে নিরস্ত হল না, সেও তার সঙ্গে লেগেও রইল, বকুনির মাত্রাও বেড়ে গেল। ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে পাঁচিলের শেষ প্রান্তে এমন এক জায়গায় উপস্থিত করল যে, ছাদের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া ছাড়া তার আর কোন উপায় রইল না। হঠাৎ বাপ ছেলের হাল্‌কা দেহের উপর নিজের দেহের সমস্ত ভার দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। চিত্রগ্রীবের পা ফস্‌কে গেল, আধ ফুট পড়তে না পড়তেই সে তার ডানা মেলে উড়তে শুরু করল। সকলের পক্ষেই কী আনন্দের কথা! তার মা নিচে জলে ডুব দিয়ে বৈকালের প্রসাধন সম্পন্ন করছিল, ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ছেলের সঙ্গে উড়তে শুরু করল। ছাদের উপর অন্তত মিনিট দশেক চক্রাকারে উড়ে তারা নেমে

এল। ছাদে পেঁছে মা দস্তুরমাফিক ডানা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসল। কিন্তু চিত্রগ্রীবের কথা অন্য ; ছোট ছেলে ঠাণ্ডা গভীর জলে গিয়ে পড়লে যেমন ভয় পায়, তারও তেমনি অবস্থা, তার সারা দেহ কাঁপছে, নেমে এসেও ছাদের উপর পা পাততে পারছে না ; টাল্ সামলানোর জন্য ডানা ঝট্‌পট্ করে সে পিছলে বেড়াতে লাগল—পায়ে যেন চাকা বাঁধা আছে। শেষে দেওয়ালের এক পাশে ধাক্কা খেয়ে সে থেমে গেল, আর অমনি চট করে তার ডানা মুড়ে ফেলল, যেমন করে আমরা সুতোয়-গাঁথা তাল পাতার পাখা বন্ধ করি। উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে, তার মা এগিয়ে গিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল—সে যেন নিতান্ত শিশু যাকে জড়িয়ে রাখা দরকার। কাজ ঠিকমত সম্পন্ন হয়েছে বুঝে চিত্রগ্রীবের বাপ তৃপ্ত মনে স্নান করতে নেমে গেল।





তীর নিক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



[পরীক্ষাভূমি। রাজা, রাজকুমারগণ, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট।]

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চলবে না।

যুবরাজ। চলবে না তো কী। আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎসংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে। আর যদিবা নাই চলত, তবু আমার জেতবার কোন সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুমি যদি হার, তবে আমি ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

যুবরাজ। না ভাই, ছেলেমানুষি কর না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হয়েছে—ধনুক গ্রহণ কর। মনোযোগ কর। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

[যুবরাজের তীর নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ। যাঃ ফসকে গেল।

যুবরাজ। মনোযোগ করেছিলুম খাঁ সাহেব, তীরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয় পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

ইশা খাঁ। তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না, তা জান? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ কর, মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ। এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন কর।

[রাজধরের তীর নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ। যাক, তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে—লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করে নি।

যুবরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর একটু হলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর। লক্ষ্য বিদ্ধ তো হয়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ওই যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ। না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

[ইন্দ্রকুমারের ধনুক গ্রহণ]

যুবরাজ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) ভাই, আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও, তা হলে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

[ইন্দ্রকুমারের তীর নিক্ষেপ]

নেপথ্যে জনতা। জয়, কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়।

[বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন]

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি সাহেব, পরীক্ষা করে আসুন, কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান]

[তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ]

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়োমানুষ, চোখে তো ভুল দেখছি নে। এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। তাই তো। একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হল!

রাজধর। আজ নয়, মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে।

ইশা খাঁ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। আমি বুঝেছি।

রাজধর। মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার। (জনান্তিকে) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে যে মুখে চুনকালি পড়বে। বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না—অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ। কী হয়েছে বাবা! এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনও জলে ভাসে না, বানরে কখনও সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বল তো কী হয়েছে? তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ। তাই তো দেখছি—তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বল, এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল?

ইন্দ্রকুমার। সে কথায় প্রয়োজন নেই, খাঁ সাহেব।

ইশা খাঁ। ঠিক করে বল বাবা—তুমি নিশ্চয় জান কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তীর বদল করেছে।

ইন্দ্রকুমার। চুপ কর খাঁ সাহেব। ও কথা থাক।

ইশা খাঁ। তা হলে তুমি হার মানছ?

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাশ বাবা, শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে! মহারাজ, কোথাও একটা কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে-কথাটা প্রকাশ হচ্ছে না। আর একবার পরীক্ষা না হলে ঠিকমত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর। খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে সে-অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাই নে, মধ্যমকুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ। সে-কথা আমি বলতে পারি নে—তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে, তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

[তলোয়ার প্রদান]

রাজধর। পুরস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারও মন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকে দিলুম।

[ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসরকরণ]

ইন্দ্রকুমার। (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক! তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে?

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী! ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস কর! তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ কর না।

ইশা খাঁ। পুত্র, একি পুত্র! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ!

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, আমাকে ক্ষমা কর। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ। ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চল।

ইন্দ্রকুমার। (মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা বলছ, সেনাপতি?

ইশা খাঁ। আরাকানরাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভাল কথাই বলেছ, সেনাপতি। খবর পেয়েছি, আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। বারবার শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল বৎসগণ? আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজী কী?

ইন্দ্রকুমার। আছি। দাদাও যাবেন।

রাজধর। আমিও যাব না মনে করছ নাকি?

মহারাজ। তবে ইশা খাঁ, তুমি সৈনাধ্যক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রুবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।



सत्यमेव जयते